ধন্যবাদ মাস্টারমশাই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর প্রকাশন । কলিকাতা-৬

"রা-স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীমতী সুজাতা মুখোপাধ্যায়
সুচরিতাসু

জনসংখ্যা যে বাড়ছে সেটা তত অ্যালার্মিং নয়। ভয়ের কথা হল, ভদ্রলোক কমছে, ছোটলোক বাড়ছে। বুঝলি? আর ছোটলোকের সংখ্যাধিক্য হলেই ইমব্যালান্স আসে।

লোকটা কিন্তু শুনতে পাচ্ছে মহীদা।

শুনুক। শোনানোর জন্যই তো বলা। সঙ্গে আবার সেতার বা তানপুরা গোছের কিছু রয়েছে দেখছি। শিল্পী-টিল্পী হবে। এসব লোককে শিল্পী ভাবতে লজ্জা করে।

ছেড়ে দাও না মহীদা। কয়েক ঘন্টার তো রাস্তা। তাজু তো দিব্যি বসে বসে ঘুমোবে।

আরে সে তো ট্রেন ছাড়লে আমিও ঘুমোব। বরাবর ট্রেনে উঠলেই আমার ঘুম পায়। সেটা তো কথা নয়। লোকটা ওপাশে উঠে গেলে তাজু আমাদের সঙ্গে বসতে পারত। আড্ডা মারতে মারতে যেতাম।

তাজুর পাশে দু'জন মহিলা, মা আর মেয়ে। ওদের সঙ্গে জমে গেছে তাজুর।

সে ঠিক আছে, কিন্তু লোকটা কেমন কাটখোট্টা মুখে রিফিউজ করল বল তো! ওকে তো আর আমরা সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতে বলিনি! সামান্য একটু সিট বদল করা। একা মানুষের তো কোনও অসুবিধা ছিল না।

ছিল। সঙ্গে মালপত্র রয়েছে না! সুটকেস, তানপুরা বা সেতার যা-ই হোক, তা ছাড়া জানালার ধারের সিট।

এসি চেয়ারকারের জানালা দিয়ে কি বাইরের কিছু দেখা যায় বল! আর ওই সেতার আর সুটকেস তো আর আমরা সরাতে বলিনি, ওখানেই থাকত।

যেতে দাও। তোমার একটু ইগোতে লেগেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষকে একটু ক্ষমা করে দেওয়াও প্র্যাকটিস করো।

ক্ষমার কথা আর বলিসনি। রোজ ডজন ডজন লোককে ক্ষমা না করলে কি টিকে থাকতে পারতুম নাকি! ব্রেকফাস্ট হয়নি বলে মেজাজটা একটু খিঁচড়ে আছে ঠিকই। বেয়ারা-ফেয়ারাগুলো এখনও আসছে না কেন রে?

আসবে আসবে। ট্রেন ছাড়তে দাও। এখনও প্যাসেঞ্জার উঠছে দেখছ না?

আজকাল এসি-ফেসির কোনও প্রেস্টিজ নেই বুঝলি! একদম জনতা কামরা হয়ে গেছে। চারদিকে এত মধ্যবিত্ত কেন বল তো! বড় বড় মলগুলোতে যা, দেখবি ট্রলি ঠেলে ঠেলে সব মধ্যবিত্ত মেয়ে-পুরুষ ঘুরে ঘুরে হাঁ করে জিনিস দেখছে আর পাগলের মতো কিনছে, বড় বড় রেস্টুরেন্টে গিয়ে দ্যাখ সব টেবিলে মধ্যবিত্ত পুরুষ-মেয়ে হা-ঘরের মতো গিলে যাচ্ছে, এমনকী পাঁচতারা হোটেলগুলোতে অবধি মধ্যবিত্তরা ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়েছে। নাঃ, আভিজাত্য জিনিসটাই উবে গেছে দেশ থেকে।

তুমি একটু স্নব আছ। কিন্তু গলা অত তুলো না। পাঁচজন শুনতে পেলে প্যাঁদাবে।

সমবেত প্যাঁদানোটা আমজনতার হাতে। ভদ্রলোকেরা সমবেত হতে পারে না বলে প্যাঁদায় না, তবে বুকনি ঝাড়ে। এই দ্যাখ না, ওই কাপলটা বর-বউ মিলে কেমন কুলিটার সঙ্গে ঝগড়া করছে! এসিতে উঠেছে, কিন্তু কুলিকে দুটো টাকা বাড়তি দেওয়ার কলজে নেই।

চেপে যাও না দাদা। চিরকাল প্যাসেঞ্জার আর কুলিতে ঝগড়া হয়ে আসছে। নতুন কিছু তো নয়।

ওরে, সেই কথাই তো বলছি। ঝগড়া করে মধ্যবিত্তরা। কুলিরাও বোঝে যে, এরা খুব ওপরের ক্লাসের লোক নয়। একটা ঘ্যামা বড়লোক ঝগড়া-টগড়া করে না। যা দেয় কুলি সেলাম বাজিয়ে চলে যায়। লোক চেনে কিনা।

তুমি না বামপন্থী! তুমি না বড়লোকের ওপর হাড়ে চটা!

সে তো বটেই! বড়লোকদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু আভিজাত্যকে করি। গাড়ি ছাড়ল নাকি রে?

হ্যাঁ। এই ছাড়ল।

এই কামরাগুলো যাচ্ছেতাই। বাইরের কোনও অ্যামবিয়েন্স পাওয়া যায় না। গার্ডের বাঁশি, ট্রেনের হুইসেল, কিচ্ছু শোনার উপায় নেই।

এটাও আভিজাত্য দাদা। ওসব শোনা গেলে আর এসি কেন?

তাজুর কাছে ব্যাগ আছে, একটা দিতে বল তো!

এখন পান খাবে মহীদা! পিক ফেলবে কোথায়?

তাজু কোথায় ফেলছে?

তা জানি না।

আরে, নো প্রবলেম। ক্যারিব্যাগে ফেললেই হবে।

সেটা নুইস্যান্স হবে। তার চেয়ে ব্রেকফাস্টটা হয়ে যাক, তারপর খেয়ো।

খিদে মারার জন্যই তো জর্দাপান খেতে চাইছি। এরা কখন খাবার দেবে তার ঠিক কী?

গাড়ি ছেড়েছে, এবার ঠিক দেবে। তোমার ধৈর্য এত কম কেন বলো তো!

খুব গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

মহীতোষ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। বলল, কে একটা সপেটা মারল বল তো!

আমার পাশের ভদ্রলোক।

সিটটা চেঞ্জ করি আয়।

করছি। উলটোপালটা কিছু বোলো না যেন!

জহ্নু আইল সিটে সরে এল। মহীতোষ মাঝখানের সিটে বসে খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুনল। তারপর বলল, ওস্তাদের গলা মশাই!

ধুতি পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়সি ভদ্রলোক একটু হাসলেন, ওই একটু অভ্যাস আছে।

কী নাম বলুন তো আপনার!

নিবিড় মিত্র।

নামটা তো শোনা নেই!

আমি এদিককার লোক নই। লখনউতে দুই পুরুষের বাস।

তাই বলুন। এদিককার সব ওস্তাদকে চিনি। মাড়োয়াটা আর-একবার একটু ধরুন তো!

জহ্নু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার এই জ্যেঠতুতো ব্যাচেলার দাদাটিকে নিয়ে পথে বেরোলে সর্বদাই নানারকম মুশকিলে পড়ে যেতে হয়। তবে উলটোপালটা বললেও মহীতোষের ওপর কাউকে কখনও রাগ করতে দেখেনি জহ্নু। ব্যায়ামবীর লক্ষ্মণ শীলকে একবার বলেছিল, গায়ে ডুমো ডুমো এত মাংস ঝুলছে, তোমার নড়াচড়া করার অসুবিধা হয় না! লক্ষ্মণ এ কথায় রাগ তো করেইনি, উপরন্তু বেশ গায়ে গায়ে ভাব হয়ে গিয়েছিল মহীতোষের সঙ্গে। মনাদার বউ একটু মোটাসোটা বলে তাকে প্রথম দিন দেখেই ডানলোপিলো বলে ডেকেছিল মহীতোষ। মনাদার বউ কাতু বউদি একটু থলথলে হলেও দারুণ রূপসী। ডানলোপিলো শুনে চটে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দু'দিনেই মহীদাকে বেশ পছন্দ করে ফেলে। বলতে কি, মহীদাই তাকে পান-জর্দা ধরিয়েছে এবং যোগব্যায়াম। মনাদা দুঃখ করে বলে, মহীর জন্য বউটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।

টয়লেট থেকে ফেরার পথে জহ্নু তাজুর কাছে দাঁড়াল। তাজুর হুঁশই নেই। দুই নতুন বান্ধবীর সঙ্গে সম্মোহিত হয়ে নিজের বরের ভুলোমনের কথা গল্প করছে।

কী রে ব্রেকফাস্ট নিবি তো?

তাজু ভ্রু কুঁচকে বলল, আমি আবার কবে বাইরের খাবার খাই? সঙ্গে বিস্কুট আছে, চা-ওয়ালা এলে চা নেব।

ওই অখাদ্য প্রোটিন বিস্কুটগুলো?

মোটেই অখাদ্য নয়। আমার ওই ভাল। তোরা ব্রেকফাস্ট খা, আমার জন্য ভাবতে হবে না।

তাজু এমনিতে বাইরের খাবার খায় না ঠিকই, তবে সেটা

বিয়ের পরের ডেভেলপমেন্ট। এখনও পছন্দসই ফুচকাওলা পেলে দশ-বারোটা সাঁটিয়ে দিতে পারে। ওর বর শান্তনু একটু পিটপিটে, স্বাস্থ্যসচেতন এবং পিউরিটান লোক। আপাতত মাস দুয়েকের জন্য অফিসের কাজে ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে। বিরহকাতরা তাজু ঈষৎ মলিন মুখে তাদের সঙ্গী।

জহ্নু চলে আসছিল। পিছন থেকে তাজু ডাকল, এই দাদা, শোন, শোন! এই দ্যাখ, আমার সঙ্গে ব্রেবোর্নে পড়ত মৃণালিনী! আমার ক্লাসমেট, ইনি তার মাসি। আর এ ঈশানী, ওঁর মেয়ে। এ-ও ব্রেবোর্নে পড়ে। মাসি, এই আমার দাদা জহ্নু। আমার চেয়ে দু'বছরের বড়।

মৃণালিনীকেই মনে পড়ল না জহ্নুর। তবু তার মাসিকে ভদ্রতার খাতিরে একটা নমস্কার করল। ঈশানীর দিকে একটু হাসি। ঈশানী বেশ সুন্দরী, মাসি ততোধিক। পিছন থেকে জহ্নু লক্ষ করছিল, আশপাশের কেউ কেউ এদের তিনজনের দিকে একটু বিশেষ ভাবে তাকাচ্ছিল। তাকানোরই কথা। তিন-তিনটে সুন্দরী মহিলার সম্মেলন তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়!

কাঁচা পাউরুটি জিনিসটা জহ্নুর পছন্দ নয়। আজকাল যখন এসব কামরায় মোবাইল ফোন চার্জ করারও ব্যবস্থা থাকছে, তখন রেস্টুরেন্ট কার-এ কেন পাউরুটি সেঁকার ব্যবস্থা থাকে না, তা বোঝা মুশকিল। মহীতোষের অবশ্য ওসব বায়নাক্কা নেই। মাঝে মাঝে মহীতোষ সগর্বে বলে থাকে, অম্বল কাকে বলে তা আমি জানিই না। সুতরাং জহ্নু তার দু' পিস পাউরুটি বিনা বাধায় মহীদার প্লেটে চালান করে দিল। মহীতোষ অবশ্য এসব ছোটখাটো ব্যাপার লক্ষই করল না। নিবিড় মিত্রর সঙ্গে

ওস্তাদি গান নিয়ে তুমুল আড্ডা দিচ্ছে। সদারং, ডোভার লেন, কিরানা ঘরানা ইত্যাদির ফাঁকে ফাকে বড় বড় কামড়ে ঢাউ ঢাউ করে পাউরুটি উড়িয়ে দিল, কপ করে গিলে ফেলল ওমলেট। জহ্নু সাইডব্যাগ থেকে হাওড়া স্টেশনে কেনা নিউজ ম্যাগাজিনটা বের করে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মন দিতে পারছে না। টেনশন থাকলে মন বসানো মুশকিল।

টেনশনটা তার জন্য অপেক্ষা করছে দুর্গাপুরে। খুব সাংঘাতিক কিছু নয়, মৃদু এবং হয়তো বা মধুর টেনশন। রোমান্টিকও বলা যায় হয়তো। তবে কে জানে সাপ খুঁড়তে কেঁচোও বেরতে পারে। পর্বত কি আর মূষিক প্রসব করে না?

ট্রেনের দুলুনি এবং মনোরম কৃত্রিম ঠান্ডায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল জহ্নু। গায়ক ভদ্রলোক টয়লেটে যাবেন বলে হাঁটু সরাতে গিয়ে ঘুম ভাঙল তার।

কোথায় এলাম মহীদা?

কোথাও আসিনি রে! ট্রেন তো মুভিং। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বর্ধমান।

দুর্গাপুর জায়গাটা কেমন বলো তো মহীদা!

কেন, তুই যাসনি কখনও?

কোনও অকেশন তো হয়নি দুর্গাপুর যাওয়ার। স্টেশনটাই শুধু ট্রেন থেকে দেখেছি।

জায়গা কিছু খারাপ নয়। প্ল্যানড সিটি। তবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন যেমন হয় তেমনি। তুই কখনও মানস আর কেয়ার কাছে যাসনি তাহলে?

না। কেয়া বউদিকে তো দেখিইনি। মানসদাকে এক-

আধবার ফ্যামিলি গ্যাদারিং-এ দেখেছি মাত্র। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ কোথায় আমার বলো? তবে বাবা খুব আত্মীয়বৎসল। কাছে বসলেই কত সম্পর্কের রেফারেন্স যে দেয়, আমি অত জটিল সম্পর্ক বুঝতেও পারি না।

ওটা কাজের কথা নয়। আত্মীয়স্বজনকে ফ্যালনা ভাবলে ঠকে যাবি। কোনও প্রবলেম নিয়ে হয়তো কোনও দফতরে গেলি। সেখানে চেয়ারে যে লোকটা বসে আছে সে হয়তো তোর মামার শালা। কিন্তু চেনা নেই বলে কাজটা আদায় করে আসতে পারলি না। কিংবা ধর রেলে বিনা টিকিটে ধরা পড়েছিস, চেকারটা তোর পিসতুতো দিদির দেওর। কিন্তু আত্মীয়তার ধার ধারিসনি বলে গুচ্ছের ফাইন আর টিকিটের দাম গুনাগার দিতে হল।

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না মহীদা। শুধু কাজ আদায় আর স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কি আত্মীয়স্বজন?

সেটাই বা কম কী? হ্যাঁরে লোকটা কি বড়-বাইরে করতে গেল নাকি? ছোট-বাইরেতে তো এত সময় লাগার কথা নয়।

হয়তো সিগারেট-ফিগারেট খাচ্ছে।

আরে না, আজকাল করিডরে খাওয়াও বারণ।

ওসব মানতে বয়েই গেছে লোকের। একটু আগেই তো টয়লেটে যাওয়ার সময় দু'জনকে ফুঁকতে দেখলাম। ওই তো তোমার বন্ধু আসছে।

বড় গুণী মানুষ রে। শাস্ত্রটা খুব ভাল জানে।

বর্ধমানে ট্রেন থামতেই তাজু উঠে এল।

এই দাদা, জল খাবি? মহীদা, তুমি খাবে?

মহীতোষ মাথা নেড়ে বলে, আরে না। দু' কাপ চা মেরে দিয়েছি।

জহ্নু বলল, তুই কেয়া বউদিকে কখনও দেখেছিস?

ও মা! কেন দেখব না? মাখনদার বিয়ের সময়েই তো আলাপ হয়। তার পরও কত বার! এই তো সেদিন বিনতার বিয়েতে কত গল্প হল।

আমি তো দেখিনি। ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে লজ্জা করবে।

তুই তো মুখচোরা আর একাচোরা। চেনা হবে কী করে? আত্মীয়স্বজনদের বিয়ে, অন্নপ্রাশনে কখনও যাস? আনসোশ্যাল কোথাকার। বিয়ে হলে যদি মতিগতি একটু বদলায়।

আর জ্ঞান দিস না। ভদ্রমহিলা কেমন? মানে অহংকারী-ফহংকারী নয় তো! কোনও কোনও মহিলা আবার ক্যাটক্যাট করে কথা শোনায়।

গিয়েই বুঝবি, আমি বলব কেন?

কো-অপারেট না করলে দুর্গাপুরে নেমেই ফিরতি ট্রেন ধরব কিন্তু।

তা তুই পারিস।

তাজু জায়গায় ফিরে গেলে ফের ঘুমোল জহ্নু। ঘুম ভাঙল একেবারে দুর্গাপুরে।

ওঠ! ওঠ! নাম! নাম!— বলে মহা শোরগোল ফেলে দিলে মহীদা। তাদের সঙ্গে লটবহর বিশেষ নেই। জহ্নুর একটা ওয়ান নাইটার। মহীদার একখানা মাঝারি ধরনের ব্যাগ, তাজুর সুটকেসটাই যা একটু বড়। আর ক্যারিব্যাগে সৌজন্যমূলক

দুটো মিষ্টির প্যাকেট। দুর্গাপুরে বিস্তর লোক নেমে প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড় হয়ে গেল। আর ওই ভিড়ের মধ্যেই একটা শ্যামলা হাসিমুখ এগিয়ে এল।

এসে গেছ!

দাদা-টাদা গোছের লোককে প্রণাম-ট্রনাম না করলেও হয়। কিন্তু তাজু পাকনিই বিপাকে ফেলল তাকে। উবু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে একেবারে গদগদ, ভাল আছ মানসদা?

অনিচ্ছের সঙ্গে জহ্নুও প্রণাম করে উঠতেই তার কাঁধে হাত রেখে মানসদা বলল, তোর সঙ্গেই আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

মহীদা নতুন লোক নয়। সে প্রায়ই দুর্গাপুরে মানসদার বাড়িতে হানা দেয়।

বাইরে এসে একটু চমক লাগল জহ্নুর। মানসদার গাড়িটা একদম ঝকঝকে নতুন ইনোভা। ব্রোঞ্জ রঙের। মানসদা ইঞ্জিনিয়ার এটা সে শুনেছে। এবং ভাল চাকরি করে, এটাও জানে। তবে এতটাই ভাল তা জানা ছিল না।

চাপা গলায় তাজুকে জিজ্ঞেস করল, নিজের গাড়ি নাকি রে?

এই তো গত মাসে স্করপিওটা বিক্রি করে এটা কিনল।

এত সব দরকারি খবর তার জানাই ছিল না। আত্মীয়-স্বজনদের এক্সপ্লোর না করার ফলে আজকাল তাকে সত্যিই মাঝে মাঝে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। ক'দিন আগে একজন খুব সাধারণ চেহারার নিরীহদর্শন এবং বেশ বিনয়ী বুড়ো মানুষ সকালের দিকে তাদের বাড়িতে হাজির। সশ্রদ্ধ হওয়ার মতো

হাবভাব নয়। একটু যেন তোতলাও। কিন্তু বাবা সেই বৃদ্ধকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। পরে জহ্নু জানতে পারে, ইনি প্রথমে ভারতীয় দূতাবাস এবং পরে ইউ এন ও-তে চাকরি করে এসেছেন। বাবার বড়পিসির ছেলে। বুড়োদা যে একজন জবরদস্ত লোক এটা বাবার মুখে শুনেছে বটে, কিন্তু ততটা গুরুত্ব দেয়নি। রূপকথার মতো অপ্রাসঙ্গিক কত কিছুই তো থাকে। সেই রূপকথা বাড়ি বয়ে আসায় চটকা ভেঙেছিল জহ্নুর।

জহ্নুর জড়তা কাটতে একটু সময় লাগে। মানসদার বাড়িতে এসেও লাগত। কিন্তু সেই জড়তাটুকু এক ঝটকায় উড়িয়ে দিল কেয়া বউদি নামের আশ্চর্য মহিলাটি। আহ্লাদী, হাসিখুশি, গোলগাল চেহারার এই মহিলাটির যে ইগো নিয়ে কোনও প্রব্লেম নেই সেটা প্রথম দর্শনেই যে-কেউ বুঝতে পারে। বয়স বড়জোর বত্রিশ-তেত্রিশ, কিন্তু শাখা-সিঁদুর কস্তাপেড়ে শাড়ি এবং প্রবীণার মতো হাবভাবে পাকা গিন্নি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। হোস্ট হিসেবে চমৎকার, কিন্তু প্রেমিকা বলে ভাবাই যায় না। একই সঙ্গে মানসদাকে চূড়ান্ত সৌভাগ্যবান এবং দুর্ভাগা বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব যত্নআত্তি করে, কিন্তু এর যে কটাক্ষই নেই! গৃহিণী ভাল, কিন্তু শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে বোধহয় তেমন উত্তেজক নয়।

অবশ্য সে ব্যাচেলর মানুষ। এত বিজ্ঞতা তার থাকার কথা নয়।

ঘরে ঢুকতেই লুচি ভাজার অমোঘ গন্ধটা পেয়েছিল। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘরোয়া পোশাক পরে যখন খাওয়ার টেবিলে

এল তখন সেই অনবদ্য লুচির সঙ্গেই ঘটে গেল সাক্ষাৎকার। আলু, কড়াইশুঁটি আর ক্যাপসিকামের তরকারিটা মুখে দিয়েই বুঝে গেল, কেয়া বউদি এক বিরল শ্রেণির রাঁধুনি। বেগুন ভাজা, রাবড়ি ইত্যাদি-সহ বৃহৎ আয়োজন দেখে সে মৃদুস্বরে বলল, আজ কি দুপুরে আপনাদের অরন্ধন?

কেয়া চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা! এ বলে কী গো অলক্ষুনে কথা! অরন্ধন হতে যাবে কেন? আমি যে কত কষ্ট করে চিতল পেটি আর বাগদা চিংড়ি আনিয়েছি!

জহ্নু হেসে বলে, সকাল দশটায় এত খেলে দুপুরে খাব কী করে?

এমা! এ তো কিছুই নয়। একটু হাঁটাহাঁটি করলেই খিদে পেয়ে যাবে।

এই মহিলার কাছে এই অ্যাপ্রোচটাই স্বাভাবিক ছিল। মানসদা মিটিমিটি হাসছিল। বলল, আমার এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই এরকম পট বেলি হওয়ার কথা ছিল নাকি? এক সময়ে ফুটবল খেলতাম। এই মহিলা আমার ফিগারটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লেন।

মহীদা কোনও উচ্চবাচ্য না করে সাঁটিয়ে যেতে যেতে বলল, তোদেরই যত ফ্যাট প্রব্লেম। আমার সাতষট্টি কেজি ওজন গত দশ বছর ধরে কনস্টান্ট আছে। সে যতই খাই না কেন!

কলঘরে তাজুর একটু বেশি সময় লাগে। নিজের শ্যাম্পু, নিজস্ব সাবান, নিজের বডি লোশন ছাড়া কখনও অন্য কারওটা ব্যবহার করবে না। শান্তনু বিদেশ থেকে প্রায়ই তার নাক-উঁচু বউটার জন্য গুচ্ছের দাম দিয়ে সুটকেস ভর্তি করে ওসব কিনে

আনে। ফলে তাজু বাথরুম থেকে বেরোলেই সারা বাড়ি একটা সুঘ্রাণে ভরে যায়। বেশ অভিজাত অচেনা গন্ধ। তাজু কলঘর থেকে বেরোতেই মানসদার চার বছর বয়সি রোগা মেয়েটা ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, তুমি কী মেখেছ গো পিসি! কী সুন্দর গন্ধ।

মহীদা নাক কুঁচকে বলল, দিলি তো খাওয়ার বারোটা বাজিয়ে? খাওয়া-দাওয়ার সময় ওসব সেন্ট-ফেন্ট মাখতে হয়? তরকারির গন্ধটাই ঝাড় খেয়ে গেল!

তাজু চোখ পাকিয়ে বলল, সেন্ট মেখেছি তোমাকে কে বলল? এটা তো কোলোনের গন্ধ।

ওই হল! কোলন তো আর জল নয়, নামে জল থাকলে কী হবে।

মানসদার একটাই সন্তান, ওই রোগা চার বছরের মেয়েটি, দোলন। অনেকক্ষণ ধরে আড়ে আড়ে জহ্নুকে দেখছে। করুণ সুন্দর টুলটুলে মুখখানা। দেখলেই মায়া হয়। ওর মা ওকে সাজানোর চেষ্টা করেনি। একটা সবুজ টপ আর কালো ঘাগরার মতো কিছু পরে আছে।

জহ্নু সংকোচ ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, আমার কাছে একটু আসবে?

লজ্জায় মায়ের আঁচলে হেসে মুখ লুকোল দোলন।

কেয়া বউদি বলল, যা না কাকার কাছে।

দোলন আস্তে আস্তে লজ্জা-লজ্জা ভাব করে কাছে আসতেই চেয়ার ঠেলে ওকে কোলে তুলে নিল জহ্নু। তাতে একটুও আপত্তি হল না দোলনের। মেয়েটাকে কোলে নিতেই ভারী

একটা অপত্যস্নেহ আর মায়ায় বুকটা ভরে গেল জহ্নুর। কে যেন বলেছিল, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।

মানসদা মোবাইলে কাকে যেন বলছে, আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এসে গেছে। কোনও টেনশন করবেন না। বিকেল সাড়ে পাঁচটা ইজ ওকে। আমরা এখন গাড়ি নিয়ে একটু বেরোচ্ছি। মার্কেট-টার্কেট আর আশপাশটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। জহ্নু এই প্রথম দুর্গাপুর এল।

জহ্নুর একটু টেনশন হচ্ছে এখন। কথাটা হচ্ছে কোনও এক বেদব্যাস ঘোষালের সঙ্গে, এটা সে আন্দাজ করতে পারে। তার বড় মেয়ে বাঁধনের সঙ্গে জহ্নুর বিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে এরা দু'জন। মানসদা আর কেয়া বউদি। বাবা এবং মা আর তাজু রাজি। বলতে কী তাদের পরিবারটা চলে তাজুর অঙ্গুলিহেলনে। বিয়ের আগে পুঁচকে বয়স থেকেই তাজুর হাতে কী করে যে সংসারের কর্তৃত্ব এবং মতামত দেওয়ার অধিকার চলে গেল কে জানে। তাজু মা-বাবাকে চালায় এবং জহ্নু একটু-আধটু ঝামটা মারলেও শেষ অবধি তাজুর কাছে তাকেও বশ মানতে হয়। বিয়ের পর অন্য পাড়ায় শ্বশুরবাড়িতে গেছে বটে তাজু, কিন্তু টেলিফোন নামক যন্ত্রটির সম্যক ব্যবহার করে রিমোট কন্ট্রোলে এখনও তার আধিপত্য বজায় রেখেছে। শোনা যায়, শ্বশুরবাড়িতেও তার দাপট অব্যাহত। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আধিপত্য বজায় রাখতে গিয়ে তাজুকে কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে হয় না, রাগারাগি করে না, চেঁচামেচিও নেই। নিঃশব্দে লাগাম ধরে নেয়। এই ম্যাজিকটা নিয়েই ও জন্মেছে। কিছু করার নেই। এর আগেই কোন ফাঁকে একদিন

মা-বাবা আর তাজু এসে বাঁধনকে দেখে গেছে। এবং তাদের বেজায় পছন্দ। আকস্মিক বিবাহ-প্রস্তাবে জহ্নু প্রবল আপত্তিও তুলেছিল। মা-বাবা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে অবশেষে তাজুকে খবর দেয়। তাজু এসে এক ছুটির সকালে তার মুখোমুখি বসে বড় বড় বাৎসল্যে ভরা চোখে চেয়ে খুবই স্নেহের সঙ্গে বলল, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন কে তোকে দেখবে বল তো! কয়েক দিনের মধ্যেই ঘরটার কী ছিরি করেছিস নিজেই চেয়ে দ্যাখ। একটা ঘেমো গেঞ্জি পরেই চারদিন অফিসে যাস। প্রায় রোজই দেরি হয়ে যায় বলে দাড়ি না কামিয়ে বেরোস। দু'মাসের ওপর চুল কাটিসনি। কত বলব বল তো!

জহ্নু রেগে গিয়ে বলল, তা বলে এসব করার জন্য আস্ত একটা বউ আনতে হবে নাকি? আমাকে আর ভজাতে হবে না, কেটে পড়। বিয়ে-ফিয়ে এখন নয়। অল ইন গুড টাইম।

ঠিক আছে। বিয়ে করতে তোকে তো কেউ জোর করছে না। মেয়েটাকে একবার ইনফর্মালি দেখে আসতে দোষ কী?

একদম না, যেখানে বিয়ে করব না সেখানে মেয়ে দেখতে যাওয়াটা অন্যায়। আমি এ ধরনের গো বিটুইন করতে পারব না, মাপ করো ভাই।

বুঝেছি। আমি ঠিক জানতাম, আমার বিয়ে হওয়ায় তুই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিস। এখন যা-খুশি করলেও কেউ কিছু বলবে না।

বেঁচেছিই তো। এখন শান্তনুর লাইফটা গিয়ে হেল করে দে।

প্রথম মিটিংটায় একরকম হারই স্বীকার করে নিয়েছিল

তাজু। ছলছলে চোখে চমৎকার একটা ট্র্যাজিক অভিনয় করে চলেও গিয়েছিল। কিন্তু তার পর নতুন উদ্যমে বাবা, মা এবং শান্তনুকে নিয়ে চড়াও হল তাজু। গত পাঁচ-ছয় মাসে এ ভাবেই ছয়-সাতবার তার ওপর সমবেত আক্রমণ হয়েছে এবং একটু একটু করে জমি হারিয়েছে জহ্নু। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কেন সে বিয়ে করবে, সিরিয়াস কোনও কারণ ছাড়াই, এটা সে বোঝাতে পারল না। এবং বোকার মতো শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিল।

বিয়ের সপক্ষে যেসব অজুহাত খাড়া করা হয়েছিল তার সব ক'টাই হাস্যকর। সে বিয়ে না করলে মায়ের নাকি খুব একা লাগছে। বাবা ভীষণ অসহায় বোধ করছে। বাড়িতে পরবর্তী প্রজন্মের আবির্ভাব না হলে নাকি লক্ষ্মীশ্রী উধাও হচ্ছে। এবং সর্বোপরি জহ্নুর নাকি অযত্নে অযত্নে চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এ কথা ঠিক যে বিয়ের আগে তাজু তার কিছু দেখভাল করত। ঘরদোর, লেখাপড়ার টেবিল হয় নিজে না হয় কাজের লোক দিয়ে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করত। নোংরা জামাকাপড়, বিশেষ করে গেঞ্জি-রুমাল-আন্ডার গারমেন্ট কাচাকুচির ব্যবস্থা ছিল নিয়মিত। তাছাড়া "দাদা, চুল ছেঁটে আয়" "দাদা, দাড়ি শেভ কর" "কোঁচকানো জামা কেন পরছিস?" এসব তাড়না তো ছিলই। তা ছাড়া জহ্নুর ওপর গোয়েন্দাগিরিও যথেষ্ট করেছে তাজু। সে যখন ঘরে থাকত না, তখন তার বই, ব্যাগ ঘেঁটে দেখত প্রেমপত্র দিয়েছে কিনা কেউ। দু'-চারটে ধরাও পড়েছে তাজুর হাতে। কাজেই তাজুর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় মন

খারাপ হলেও নিরন্তর খবরদারি থেকে রেহাই পেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিল সে। বিয়ে করলে এই স্বাধীনতাটুকুর যে বারোটা বাজবে এটা সে খুব জানে। কিন্তু মুশকিল হল সে খুব কঠোর প্রকৃতির পুরুষ নয়। চাপের কাছে ভেঙে পড়ার দীর্ঘ ইতিহাস আছে তার।

এই বয়সের বাচ্চারা কলকল করে কথা বলে। কিন্তু দোলন নয়। সে ভারী চুপচাপ, শান্ত, পাখির পায়ের মতো রোগা হাতে শুধু আঁকড়ে ধরে আছে জহ্নুর হাত। মুখে সব সময়ে একটু হাসি আর বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকা। গড়ানে চওড়া বারান্দা পেরিয়ে জহ্নু যখন সামনের বাগানে এল তখনও গায়ের সঙ্গে সেঁটে দোলন। কে জানে কেন, বোধহয় বোকা-সোকা ভাল মানুষ বলে চিনতে পেরেছে, তাই তার সঙ্গ ছাড়ছে না। বড় বড় কিছু গাছ রয়েছে বাগানে। সব চেনে না জহ্নু, শুধু তিনটে আমগাছ চিনতে পারল। খুব পাখি আছে এখানে। হেমন্তের খোলা হাওয়া আছে। আর আছে গাছের প্রগাঢ় ছায়া। সামান্য জ্বরের মতো উপভোগ্য রোদ।

আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে দোলন?

হ্যাঁ।

ফটক পেরিয়ে নিরিবিলি রাস্তাটায় ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দোলন মুখ তুলে বলে, তোমার সঙ্গে বাঁধনদির বিয়ে হবে?

একটু হেসে জহ্নু বলে, হতেও পারে। তুমি বাঁধনদিকে চেনো বুঝি?

হ্যাঁ তো। আমার সঙ্গে খুব ভাব।

তাই বুঝি?

আমি বাঁধনদির কাছে নাচ শিখি তো।

তুমি নাচতে পারো বুঝি?

একটু একটু পারি। পায়ে ব্যথা হয়।

আহা রে! পায়ে ব্যথা হলে নাচবার দরকার কী?

নাচতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

তাহলে তোমার কী ভাল লাগে?

রঙিন ছবি আঁকতে।

বাঃ, সেও তো খুব ভাল জিনিস।

আজ রবিবার তো, আজ সকালে নাচের ক্লাস ছিল। আজ বাঁধনদি ছুটি দিয়েছে।

ওমা! কেন?

আজ যে তোমরা বাঁধনদিকে দেখতে আসবে!

তাও তো বটে।

বাঁধনদি কিন্তু কাল খুব কেঁদেছে।

কেঁদেছে! কেন বলো তো!

কী জানি!

জহ্নু একটু অবাক হল। কান্নার বিশেষ কি কোনও কারণ আছে?

কান্নাটা অবশ্য বিকেলে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না জহ্নু। হিলহিলে, মেদহীন সটান চেহারার যে মেয়েটি সোফায় একটেরে এসে বসল তার মুখশ্রীতে রাবীন্দ্রিক নায়িকার মতো লাবণ্য। সামান্য গাম্ভীর্য ছিল বটে, কান্না ছিল না। কিন্তু কান্নাটা আছে। কোথাও আছে। টের পাচ্ছিল জহ্নু।

সবার আগে মহীদা বলে উঠল, আরে! এ তো পাগলের মতো সুন্দর! এত সুন্দর হওয়ার দরকারই ছিল না! এর অর্ধেক হলেও চলত!

বেদব্যাস আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন। তার বউ কৃষ্ণাও। বাঁধন মুখ নামিয়ে নিল।

জহ্নুর কানে কানে তাজু বলল, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? কথাটথা বল। আনস্মার্ট কোথাকার!

জহ্নু বলল, কী কথা বলব? আমার কোনও কথা নেই।

কথাটা ভুল। জহ্নুর কথা আছে। তবে সেটা প্রকাশ্যে বলার মতো নয়। এরকম এক প্রাচীন ও অচল রীতিতে পাত্রী দেখা অর্থহীন। একগাদা গুরুজন গায়ে গায়ে বসে থাকলে প্রাসঙ্গিক দু'টি নরনারী কী করে কথা বলবে?

বেদব্যাস অবশ্য যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়ে বললেন, আরে যাও না, তোমরা দু'জন ভিতরের ঘরে গিয়ে একান্তে একটু কথা বলে নাও। লজ্জার কিছু নেই। উই ডোন্ট মাইন্ড।

মেয়েটি উঠল না। বসে রইল। জহ্নুও। সে আঁতিপাঁতি করে কান্নাটা খুঁজছিল। এবং শেষ অবধি পেয়েও গেল। এত সূক্ষ্ম যে আর-একটু হলেই চোখের আড়াল হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হল না। সবুজ তাঁতের শাড়িটার সোনালি কলকা পাড়ের একটা ভাঁজ লম্বা লীলায়িত আঙুলে সটান করছিল বাঁধন। তখনই একটা বড় শ্বাস তার অজান্তেই খুব সামান্য বাঁশপাতার মতো থিরথিরে একটা কাঁপন তুলে গেল দু'টি পাতলা ঠোঁটে। খুব সামান্য কাঁপল। কিন্তু জহ্নু নিশ্চিন্ত হল। কান্নাটা আছে। ভীষণ ভাবে আছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে জহ্নু প্লেট থেকে শিঙাড়া তুলে খেতে লাগল। আলু আর নতুন ফুলকপির পুরভরা চমৎকার শিঙাড়া। মৃদু মশলার গন্ধ। খাস্তা। দুপুরের গুরুভোজনের পরও বড় ভাল লাগছিল খেতে।

ফোনটা এল রাত সাড়ে বারোটায়। তার মোবাইলে।

প্লিজ, আপনি এই বিয়েতে রাজি হবেন না। আমার একটু প্রবলেম আছে।

জহ্নু বলল, জানি।

ভয়-খাওয়া গলাটা আরও একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, জানেন! কী জানেন?

শুধু এইটুকু জানি যে, এই বিয়েতে আপনার প্রবলেম আছে।

একটু চুপ করে ফের সরু আর ভিতু গলাটা বলল, আপনি এটাকে দয়া করে রিফিউজাল বলে ধরে নেবেন না যেন।

ধরে নিলেই বা ক্ষতি কী? এটা একরকম রিফিউজালই তো! তবে এরকম তো হতেই পারে।

আপনি কষ্ট করে এত দূর এলেন, নিশ্চয়ই এরকমটা এক্সপেক্ট করেননি!

তা নয়। ধরুন আমিও তো নারাজ হতে পারতাম। নেগোসিয়েশনে তো এরকমই হয়। অনেকগুলো বর্জনের পর একটা গ্রহণ।

কিন্তু আমারই কি উচিত ছিল না আপত্তিটা আগেই জানিয়ে রাখা! তাহলে আপনাদের এই হ্যারাসমেন্টটা হত না।

তাতে কী? দুর্গাপুর জায়গাটা আমার দেখা ছিল না। দেখা

হয়ে গেল। এখন একটাই প্রবলেম। আমার বোন বা মা-বাবাকে কী বলা যায়! আমি মিথ্যে কথাটা তেমন গুছিয়ে বলতে পারি না। ধরা পড়ে যাই।

আপনার পছন্দ হয়নি, এ কথাটা তো বলতেই পারেন!

সেটাই তো মিথ্যে। বরং এ কথাটা আপনি বললে হয় না?

সেটাও হয়তো মিথ্যেই হবে। আপনি যাহোক করে প্লিজ ম্যানেজ করে নেবেন।

সেটা তো নিতেই হবে।

আমার মা আর বাবা ধরেই নিয়েছেন যে আপনি আমাকে এবং আমি আপনাকে পছন্দ করে ফেলেছি।

হুঁ। ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য এটুকু করব। নিশ্চিন্তে ঘুমোন।

ঘুম! হ্যাঁ, একদিন তো ঘুমোতেই হবে। ছাড়ছি।

শেষ কথাটা একটু কেমন যেন লাগল জহ্নুর। কথাটায় কি কোনও ভয়ংকর ইঙ্গিত ছিল?

ঘুম থেকে খুব ভোরেই উঠে পড়ল জহ্নু। ঘুমটা ভাল হয়ওনি তার। বার বার ভেঙে গেছে। তাজুকে কী বলবে সেটাই তার কাছে উদ্বেগের বিষয়। তাজু বুদ্ধিমতী এবং নিজের বোকাসোকা দাদাটিকে খোলা বইয়ের মতো পড়ে ফেলতে তার একটুও দেরি হয় না।

বাইরে এখনও আধো অন্ধকার। পাখি ডাকছে এবং সকলেই ঘুমে। জহ্নু পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়ে চটি পায়ে গলিয়ে নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে অনেকটা হাঁটল। সকালবেলাটা এখানে বেশ ঠান্ডা এখন। গায়ে একটা চাদর থাকলে ভাল হত। তবে জোর

কদমে হাঁটায় একটু বাদেই শরীর একটু গরম হল।

দু'বার রাস্তা গুলিয়ে ফেলে এবং বার চারেক হোঁচট খেয়ে যখন ফিরল তখন বাড়িতে রীতিমতো উদ্বেগ।

কোথায় গিয়েছিলি?

একগাল হেসে সে বলে, মর্নিং ওয়াক!

তাজু গালে হাত দিয়ে বলল, কোথায় যাব বাবা! সূর্য আজ কোন দিকে উঠল!

দুই

বাবা, তুমি বুড়ো হয়েছ না?

বুড়ো হয়েছি! কে বলল?

ইয়ারকি কোরো না তো! বুড়ো হয়েছ কি না বলো!

বুড়ো মনে করলে বুড়ো।

সাতান্ন বছর বয়স কি অনেকটাই বয়স নয়?

সে তো বটেই। তবে পঁচাত্তর বছর আরও অনেকটা বয়স।

ফের ইয়ারকি! তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না কিন্তু কথাটা।

ওরে ব্যাপারটা আগে খুলে বল। আমি বুড়ো হলে তোর সুবিধে কি? আমাকে বুড়ো বানানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছিস কেন?

তোমার ইস্কিমিয়া আছে?

না।

সুগার?

না।

আর্থ্রাইটিস?

তাও নেই।

অ্যাটলিস্ট ব্লাড প্রেশার?

আছে। আমাকে রেগুলার ওষুধ খেতে হয়, দেখিসনি?

আচ্ছা মায়ের কী কী প্রবলেম আছে বলো তো! এনি ওল্ড-এজ ডিজিজ?

তোর মা আমার চেয়ে নয় বছরের ছোট। শি ইজ ওনলি ফর্টি এইট।

ফর্টি এইট ইজ এ হিউজ এজ।

অম্বলে খুব ভোগে জানিস তো!

আর কিছু?

ডাক্তার একবার বলেছিল ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। আর হ্যাঁ, খুব সম্ভব একটু অ্যানিমিক। আর কোলেস্টেরলও বেশি। কিন্তু এত সব জিজ্ঞেস করছিস কেন? মেডিক্যাল কভারেজ পাবি নাকি?

ওসব নয়। অন্য প্রবলেম। আমাকে বেঙ্গালুরুতে বদলি করতে চাইছে।

বাঃ, সে তো খুব ভাল কথা। ব্যাঙ্গালোরে আই টি-র মৌচাক।

ব্যাঙ্গালোর নয় বাবা, ইট ইজ নাউ বেঙ্গালুরু। আর বেঙ্গালুরু মৌচাক হোক আর ভীমরুলের চাকই হোক, আমার পছন্দের জায়গা নয়। কলকাতা কত ভাল বলো! ইচ্ছে করলেই যখন তখন তোমাদের কাছে চলে যেতে পারি।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোর বদলির সঙ্গে আমাদের বয়স আর রোগভোগের সম্পর্কটা কী?

আছে বাবা। পরশুই আমি বসকে বলেছি আমি বেঙ্গালুরু গেলে আমার বুড়ো মা-বাবাকে কে দেখবে। তাতে বস খুব

অবাক হয়ে বলেছে, ইউ আর সো ইয়ং, ইয়োর পেরেন্টস কান্ট বি দ্যাট ওল্ড। ইয়োর ড্যাড ইজ স্টিল ইন সারভিস। তখন ফাঁপড়ে পড়ে বলতে হল, আমার মা-বাবা তো অসুস্থ, তাই আমার কাছে থাকা উচিত। প্রবলেমটা বুঝতে পারছ? এখন যদি ডিটেলস জিজ্ঞেস করে কী অসুখ, তাহলে তো বলতে হবে।

দূর পাগল, ব্যাঙ্গালোর যেতেই এত অনিচ্ছে! তাহলে যখন বিদেশে পাঠাবে তখন কী করবি?

সানফ্রানসিসকো আর বেঙ্গালুরু বুঝি এক হল?

ব্যাঙ্গালোরে তোর আপত্তি কেন রে? বেশ তো জায়গা!

আমার কলকাতাই ভাল।

নতুন চাকরি, বেশি ধিঙ্গিপনা করা কি ভাল? ভাববে মেয়েটা হোমসিক।

আমি মোটেই হোমসিক নই। বলতে পারো কলকাতা-সিক।

সেটাই তো ভাববার কথা। কলকাতার মতো একটা কুম্ভীপাককে তোর কেন এত ভাল লাগে কে জানে!

ভাল লাগার কি কোনও নিয়মকানুন আছে? মণিময়ের মতো একজন ক্যাবলাকান্ত, আন-স্মার্ট, আন-সাকসেসফুল, আন-হ্যান্ডসাম লোক কী করে আমার মায়ের মতো চৌখস মেয়ের মাথাটি খেয়েছিল বলো! মণিময় কি তোমার সঙ্গে কোনও কারণেই টক্কর দিতে পারে? অথচ আমার মা দু' বছর ধরে ঠিকই করতে পারল না, শেষ অবধি কার গলায় মালা দেবে। শেষ অবধি তোমাদের মধ্যে টস হয়। এবং হেড-টেল

করে ঠিক করা হয় আমার সুন্দরী মা কাকে বরণ করবে।

ইট ইজ অ্যান ইনজাস্টিস টু মণিময়। সে একজন উদাসীন এবং এথেরিয়াল মানুষ। ইমপ্র্যাকটিক্যাল বটে, কিন্তু জেম অফ এ ম্যান।

কলকাতাও ঠিক তাই। সুন্দর নয়, ভাল নয়, কিন্তু হিপনোটিজম জানে।

ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝতে দে। তুই—

তোমাকে আর বেশি বুঝতে হবে না। বাই—

কট করে ফোনটা কেটে দিল কাঁকন। এরকমই করে। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার তো বটেই, কখনও সখনও দশ-বারোবারও তার ফোন আসে বেদব্যাস, কৃষ্ণা বা বাঁধনের মোবাইলে। কোনও কথা থাকে না প্রায়ই। আচ্ছা মা, আমার অ্যাশকালারের মিডিটা কি ফেলে এসেছি! খুঁজে দেখো তো! অ্যাই দিদি, আজ না আমার গায়ে একটা টিকটিকি পড়েছিল। এখনও গা-টা এমন শিরশির করছে! কী করা যায় বল তো? কিংবা, হ্যালো বাবা, আচ্ছা তোমাকে আমার কী একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল বলো তো! এই যাঃ, একদম মনে পড়ছে না তো! ইস, একটু ভেবে বলো না কী জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম! আচ্ছা ঠিক আছে, মনে পড়লে ফের ফোন করছি। এইরকম সব। আর প্রায় দিনই রাত বারোটা নাগাদ বাঁধনের সঙ্গে তার নাগাড়ে কথা হয়। দেড়টা-দুটো পর্যন্ত।

এই যে মেয়েটা বাঙ্গালোর যেতে চাইছে না এতে বেদব্যাসের একটু মৃদু টেনশন হচ্ছে। নতুন চাকরি। যেতে না চাইলে যদি ছাঁটাই করে দেয়! তবে ভরসা হল, কাঁকন দারুণ ছাত্রী ছিল।

এমসিএ-তে ফার্স্ট ক্লাস। চাকরির অভাব হবে না। কিন্তু এরা ওকে আমেরিকায় পাঠাবে, বলেই রেখেছিল। সেইজন্যই মনটা একটু খুঁতখুঁত করে তার। কিন্তু ভেবে দেখলে, এই পরবর্তী প্রজন্মকে একটু রেকলেস, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অ্যাডভেঞ্চারাস মনে হলেও এদেরও একটা যুক্তি ও বোধ আছে। সেটা হয়তো বেদব্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, কিন্তু হয়তো শেষ অবধি ঠিক সিদ্ধান্তই নেয়। পরের প্রজন্মের প্রতি আস্থাহীনতা পোষণ করার হয়তো তেমন কারণ নেই। ওরা কম প্র্যাক্টিক্যাল নয়। এখনকার দুনিয়াটাকে ওরা বোধহয় একটু বেশিই বোঝে। কিন্তু কথাটা বহুবচনে ভাবা ঠিক হচ্ছে না। বেদব্যাসের বড় মেয়ে বাঁধন মোটেই কাঁকনের মতো নয়। হ্যাঁ, সে কাঁকনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু ছাত্রী নিতান্তই অ্যাভারেজ। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি এসসি পাশ করে থেমে যায়। একটা কম্পিউটারের কোর্স করেছে খুব আনন্দের সঙ্গে। নাচ নিয়ে আছে বটে, কিন্তু বেদব্যাসের সন্দেহ সেটা ওর সাধনা-টাধনার ব্যাপার নয়, একটু ব্যায়াম আর একটু পাসটাইম। ছোটটির মতো চোখা চালাক নয়, একটু ভালমানুষ গোছের। বিয়ে করে সংসার করা ছাড়া তার আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি ছেড়ে একজন সাংবাদিক পাত্রকে পছন্দ করার তেমন ইচ্ছে ছিল না বেদব্যাসের। ছোকরা ইংরিজির ভাল ছাত্র। প্রফেসর হওয়ার পরীক্ষাও পাশ করেছিল। কিন্তু সেসব ছেড়ে একটা বড় কাগজে সাংবাদিকতায় ঢুকেছে। কাগজটা রাখছে বেদব্যাস। গত ছয় মাসে দু'বার বাই লাইনে দুটো খবর ছাপা হয়েছে। আর দুটো স্বনামে লেখা

আফটার এডিট। পুল আউটে গোটা দুই লেখার একটা ফ্যাশন শো, অন্যটা বিকল্প বিদ্যুৎ-এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উৎপাদনের ওপর। খারাপ নয়। বাঁধনকেও পড়তে দিয়েছিল। বাঁধন খানিকটা পড়েই কাগজ ফেরত দিয়ে বলেছে, ওসব খটোমটো লেখা আমার মাথায় ঢোকে না বাপু।

আহা, ইংরিজিটা কেমন লাগে সেটা বলবি তো!

ওসব তুমি বোঝো গিয়ে।

কৃষ্ণা অবশ্য খুশি। বলে, কাগজে নাম যখন বেরোয় তখন তো আর ফ্যালনা নয়। পাঁচজনে চেনে। জার্নালিস্টদের তো হাই-কানেকশনও থাকে।

জহ্নুর লেখার কাটিংগুলো কৃষ্ণা খুব যত্ন করে একটা ফাইলে রেখে দিয়েছে। তা দিয়ে কী হবে কে জানে। বিয়েটাই তো ঝুলে আছে। এখনও ওপাশ থেকে কোনও সবুজ সংকেত নেই। যদিও ছেলের মা বাবা আর বোন বাঁধনকে দেখে মুগ্ধ এবং আপ্লুত। মানস আর কেয়া রোজ ফোনে বলছে, বিয়ের জোগাড়যন্তর শুরু করে দিন।

বাঁধনকে কি ক'দিন যাবৎ একটু শুকনো দেখছে বেদব্যাস! একটু যেন মলিন! ওর কি জহ্নুকে তেমন পছন্দ হল না? জহ্নু সাংঘাতিক সুপুরুষ নয়। হাইট পাঁচ নয়, রং ফর্সাই বলা যায়, মুখশ্রীও বেশ। সবচেয়ে যেটা বেদব্যাসের ভাল লেগেছে সেটা হল, মুখে একটা সরলতার লাবণ্য আছে। তাজু বলছিল বটে, তার দাদা নিজের খেয়াল একটু কমই করে।

ওরা চলে যাওয়ার পরই কৃষ্ণা বাঁধনকে ধরেছিল পছন্দ হয়েছে

কি না জানতে। বাঁধন নাকি শুধু বলেছে, বেশ ভালই তো!

ওভাবে বললে কিছু বোঝা যায়? একটু খুলে বল। শুধু 'ভালই তো' বললে বাপু খটকা লাগে।

এর বেশি কিছু মনে আসছে না মা। উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো তো নয়!

এটাও এড়ানো কথা। একটা ছেলেকে দেখলি, দেখে কী মনে হল, স্মার্ট না আনস্মার্ট, অকারণে হাসে কি না, বেশি কথা বলে কি না, ওপরচালাক কি না, বদমাশের চাউনি আছে কি না চোখে, এসব তো বাপু একটু-আধটু আন্দাজ করা যায়।

আমি অত ভাল করে দেখিনি মা।

সেইজন্যই তো তোর বাবা বলল, আলাদা ঘরে বসে একটু নিজেদের মধ্যে কথা বলে নে। তা তুই তো নড়লিই না!

সারা জীবনে যা বোঝা যায় না তা কি আধ ঘণ্টায় বোঝা যাবে?

ওরে, বিয়েতে তো শেষ অবধি ফাটকাই খেলতে হয়। তবু ওর মধ্যেই যতটা সম্ভব দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে না? তারপর কপালে যা আছে তা তো হবেই।

প্রসঙ্গটা এখন থাক মা। পাত্রটিরও তো মতামত আছে।

পাত্র যদি পছন্দ করে, তোর আপত্তি হবে না তো!

আর-একটু ভাবি।

ঠিক আছে। কিন্তু ভাবতে বেশি সময় নিয়ো না যেন। মনে হচ্ছে, তোর খুব একটা পছন্দ হয়নি।

তোমাদের বুঝি খুব পছন্দ?

সত্যি কথা বলতে কী, আমার বাপু, বেশ লেগেছে। দেখেই

মনে হয় ভাল কোয়ালিটির ছেলে। ফচকে নয়। শুনেছি, বেশি বায়নাক্কাও নেই। তবে তোর বাবার খুঁতখুঁতুনি আছে। সুন্দরী মেয়ের জন্য বোধহয় আরও একটু ভাল কেরিয়ারের ছেলে এক্সপেক্ট করেছিল। সোমেন ব্যানার্জির ভাইপো শিকাগোয় থাকে, সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। পরশু দিন ফোন করে বলছিল, ডিসেম্বরে বিয়ে করার জন্য আসবে। ওরা সুন্দরী মেয়ে চায়। তোর কথাই বলছিল।

আমার বিদেশ ভাল লাগে না মা, তুমি তো জানো।

চুজি হলে তো মুশকিল। ঠিক আছে, ভাবো। দু'দিন পরেই যা হোক বোলো। কথা তো দেওয়া হয়নি।

ঠিক পাশাপাশি নয়, ঠিক মুখোমুখিও নয়। বারান্দায় একটু দূরত্বে পরস্পরের দিকে একটু ঘোরানো দু'টি বেতের চেয়ার পাতা। এই দু'টি বেতের চেয়ারে কোনও কোনও সন্ধ্যায় কিছু কথাবার্তা হয়, বেশির ভাগ সন্ধ্যা কেটে যায় চুপচাপ, শব্দহীন, সংলাপহীন। শুধু গেলাসে তরলের সামান্য শব্দ, বা কাচের সঙ্গে কাচের সামান্য ঠুনকো ধ্বনি। এই ভাবেই সন্ধে খুব ধীরে বহে যায় রাত্রির দিকে। কথার উৎসে কোনও সেচ নেই, উর্বরতা নেই। খরার ঋতুতে কুয়োর জল যেমন অনেক নিচুতে নেমে যায়, তখন লম্বা দড়িতে বাঁধা বালতি নামাতে হয় অতলে, তেমনি কথার নাগাল সরে যায় বড্ড দূরে। দু'টি চেয়ারের মধ্যে থমকে থাকে অনন্ত দূর।

বেদব্যাস টের পায়, সন্ধের পর পাশের চেয়ারটায় কৃষ্ণা নয়, নিঃশব্দে এসে বসে থাকে নন্দিনী। এরকম সন্ধেবেলা তারই তো বসে থাকার কথা ছিল পাশে! কৃষ্ণা তো নয়! বেদব্যাস আজও, যেন এক গুলি খাওয়া মানুষ, বুকের খাঁচায় বিদ্ধ একটি বুলেট নিয়ে বেঁচে আছে। ওইটে বড় টন টন করে মাঝে মাঝে। এই সাতান্ন বছর বয়সেও মাঝে মাঝে হাহাকারে তোলপাড় হয় বুক। অথচ লজিক্যালি প্রিয় বা অপ্রিয় মেয়েমানুষের মধ্যে তেমন পার্থক্য কিছু নেই। অন্ধকারে একই রকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভোগ করে পুরুষ। তফাতটা কোথায় কে জানে! আবার আরও এক রকম যুক্তি-বুদ্ধি আছে মানুষের। অপ্রিয়র মধ্যে প্রিয়কে স্থাপন করে নেওয়া। বরাবর তাই বিছানায় কৃষ্ণার ভিতরে নন্দিনীকেই নির্মাণ করে নিয়েছে বেদব্যাস। কিন্তু বিভ্রমমাত্রই ক্ষণস্থায়ী. কল্পনাশক্তির অনন্ত স্থিতিস্থাপকতা নেই।

তবু এই ঈষৎ মাদকে ডোবানো সন্ধ্যায় তার পাশে, কাছে কৃষ্ণার আদলে নন্দিনীই এসে বসে থাকে আজও। যতক্ষণ কথা না হয়, ততক্ষণই ভাল। বেদব্যাস প্রতি সন্ধ্যায় তাই প্রার্থনা করে, প্লিজ হোল্ড ইয়োর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ।

তাহলে মণিময়ের সঙ্গে দ্বৈরথে কী লাভ হল তার? একটি ট্রফি! এই ঝলক-সুন্দরীকে প্রার্থনা করেনি সে। শুধু যুদ্ধজয় চেয়েছিল বটে। নন্দিনী লুট হয়ে গিয়েছিল মাত্র সতেরো বছর বয়সে, যখন বেদব্যাস তার শেষ পরীক্ষা দিতে বসেছে কানপুর আই আই টি-তে। হতাশা আর ক্রোধে আর প্রতিশোধস্পৃহায় সে কত কী করে ফেলতে চেয়েছিল। আত্মহত্যা, মারপিট, সেনাবাহিনী বা বিমানবহরে নাম লেখানো, সন্ন্যাস, মদ্যপান,

এমনকী নন্দিনীর বরকে গুপ্তহত্যা, কিছুই পারেনি। শেষ অবধি এইটে পেরেছে। মণিময়ের দুর্বল বন্ধন থেকে কৃষ্ণাকে কেড়ে আনা। নিজেকে বিশাল বিজয়ী বলে মনে হয়নি তবু। বরং এক ক্লান্তিই আচ্ছন্ন করেছে তাকে।

তার সন্দেহ হয়, পৃথিবীর কোনও জয়ই বোধহয় নিরঙ্কুশ নয়। কে জানে, রোজ সন্ধ্যায় তার এই চেয়ারটায় কৃষ্ণার মণিময়ও এসে বসে থাকে কি না! কৃষ্ণাও কি বেদব্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে মণিময়কে নির্মাণ করে নেয় না? তাহলে কি দু'টি চেয়ারে চারজন! সে আর নন্দিনী, মণিময় এবং কৃষ্ণা!

এক নিমজ্জিত ঘোর থেকে উঠে সে বলল, কিছু বলছ?

বলছি ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঘরে চলো।

ঠান্ডা হাওয়া! কোথায় ঠান্ডা! বেশ তো লাগছে।

আমার ঠান্ডা লাগছে বাপু।

একটু খাও না, দেখবে শরীর গরম হয়ে গেছে।

না বাপু। বড্ড নসিয়েটিং। একবার খেয়ে যা হয়েছিল।

প্রথম প্রথম ওরকম লাগে। একটু অরেঞ্জ স্কোয়াশ মিশিয়ে খাও, দেখবে শরীর চনমনে লাগছে।

কী দরকার! না খেয়েই এত দিন কেটে গেল!

আমাদের এখন ভাঁটার সময়, এখন আর বাছবিচারের দরকার কী? যেমন করে যতটা ভাল থাকা যায় তেমনটা করতে দোষ কী?

এখন আবার উঠে গিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে আসতে হবে।

আরে, তুমি বোসো, আমি এনে দিচ্ছি।

বেদব্যাস গিয়ে ফ্রিজ খুলে অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে এসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে স্কোয়াশ মিশিয়ে কৃষ্ণার হাতে দিয়ে বলল, ইউ উইল ফিল বেটার। খাও।

কৃষ্ণা গেলাসটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল স্বামী-স্ত্রী মদ গিলে বসে থাকব, মেয়েটা ফিরে এলে কী ভাববে বলো তো!

কৈতব কথাটার মানে জানো?

না।

কৈতব মানে হল কাপট্য। জীবনের সর্বত্র ওই কৈতব আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা। ছেলে-মেয়ে কী ভাববে, লোকে কী মনে করবে, আমার নিন্দে হবে না তো, এই সব ভেবে ভেবে আমরা কত কিছু আড়াল করার চেষ্টা করি বলো। শেষ অবধি এই সব পলকা কপটতা দিয়েও নিজেদের আড়াল করতে পারি কি? ওসব কৈতব ভেঙে দেওয়াই ভাল। বাবা মদ খেলে যদি তেমন দোষ না হয়, মা খেঁলেই বা হবে কেন? তাই না! আর মনে যদি কিছু করেই তা একদিন-দু'দিনের জন্য। তারপর সয়ে নেবে। শাট আপ ডার্লিং।

কৃষ্ণা একটু একটু করে খেল। তারপর আরও একটু নিল।

নসিয়েটিং লাগছে না তো!

না। মনে হচ্ছে অরেঞ্জ স্কোয়াশই খাচ্ছি। কান দুটো একটু দপ দপ করছে।

দ্যাটস গুড। নির্ভয়ে খাও। ইট উইল স্টিমুলেট ইউ।

তোমাকে একটা কথা বলব বলে অনেক দিন ধরে ভাবছি।

কী কথা?

বাঁধনকে নিয়ে। শিশিরবাবুর ব্যাপারটায় ও কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। আমার ভাল লাগছে না।

শিশির তো ওর মাস্টারমশাই! বাড়াবাড়িটা কী করল?

সেই কবে যখন স্কুলে পড়ত তখন অঙ্ক কষাতে আসত। টিচারকে শ্রদ্ধা করুক তাতে তো আপত্তি নেই। শিশিরের বউ দেবীর ক্যানসার হয়েছে বলে ওর গিয়ে ও-বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ার কী? মাঝে মধ্যে তো রান্নাও করে দিয়ে আসে বলে শুনেছি। রোজ তিন-চার ঘণ্টা ও-বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকে। শিশির নাকি তার বাচ্চাকে সামলাতে পারে না বলে ও গিয়ে সামলায়। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।

ওঃ, বাঁধন তো একটু কাইন্ড-হার্টেড আছেই। রোজ রাস্তার কুকুর আর কাকদের রুটি-টুটি খাওয়ায়।

না বাপু, এসব মোটেই ভাল নয়।

আরে শিশির তো কোয়াইট এজেড ম্যান।

বুড়ো তো আর নয়। বড়জোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। এবার একটু রাশ টানা দরকার।

কিন্তু কী বলবে?

সেইজন্যই তো তোমার পরামর্শ চাইছি।

কিন্তু কৃষ্ণা, শিশির তো বড্ড ভাল ছেলে!

সেটা অস্বীকার করছি না। শিশিরের স্বভাবের প্রশংসা সবাই করে। সে গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় পড়ায়, লোকের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অত্যন্ত আদর্শবাদী, সব ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার আছে, যেটা পুরুষ মানুষেরা ততটা বুঝবে না, যতটা মেয়েরা বুঝবে।

কী সেটা?

হি ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ।

চেহারার কথা বলছ তো!

না। শুধু চেহারা নয়, তা ছাড়াও কোনও কোনও পুরুষের একটা ম্যাগনেটিক পার্সোনালিটি থাকে।

ডার্লিং, তুমি ঢলে পড়োনি তো!

মুখে কিছু আটকায় না, না? অসভ্য কোথাকার! যা বলছি সেটা মন দিয়ে শোনো। তোমার মেয়েকে এখন শিশিরের ব্যাপারে একটু রেস্ট্রিক্ট করার সময় এসেছে।

তুমি আমাকে একটা নতুন টেনশনে ফেলে দিলে। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ ঈশান কোণে মেঘ! তুমি তো জানো আমি মেয়েদের কোনও দিনই শাসন করতে পারিনি। ওরা আমাকে সেইজন্য ভয় তো পায়ই না, বরং ইয়ার বন্ধুর মতো ইয়ারকি করে, পিছনেও লাগে। যে কাজের আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাতে নিয়োগ করলে কি কাজ হবে? চিরকাল তর্জন-গর্জন তুমিই করেছ। তোমাকেই ওরা যাও-বা একটু ভয় পায়, আমাকে একদম নয়।

তর্জন-গর্জন করতে তো বলিনি। বন্ধুর মতোই বোঝাও যে, এটা খুব ভাল দেখাচ্ছে না।

আগে বলো, তুমি কি কিছু সন্দেহ করছ?

করছি।

সন্দেহটা অমূলক নয় তো! এমন কিছু কি দেখেছ বা শুনেছ যাতে সন্দেহটাকে সাবস্টেনশিয়াল বলে মনে হয়? যদি সন্দেহজনক কিছু দ্যাখোও তাহলে শিশিরের বউ দেবী কি

কিছু বলত না তোমার কাছে? যত দূর জানি দেবী ইজ ভেরি ভোকাল।

সেটা ঠিক। দেবী ভীষণ মেজাজি। শিশিরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে। ক্যানসার হওয়াতে এখন একটু দম ধরে আছে মাত্র। কিছু হয়েছে এ কথা আমি বলতে চাই না। হয়তো হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা তো মনের। ভিতরে ভিতরে কী হচ্ছে তা কে বলবে? ক্লোজ কন্টাক্টে বেশি থাকলে কত কী হয়।

বাঁধন যে বড্ড নরম মনের মানুষ।

ঠিক কথা। আর নরম মনের মানুষরাই খুব সহজে কালার্ড হয়ে যায়। বাঁধন আর কাঁকনে সেইজন্যই অনেক তফাত। কাঁকনকে চট করে কেউ মজাতে পারে না। বাঁধনকে পারে।

না, আজ রাতে আমার ঘুমের বারোটা বাজল। মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিলে ব্রাদার।

মাতাল হয়েছ নাকি? আমাকে ব্রাদার বলছ!

আপৎকালে বুদ্ধিনাশ। আর বুদ্ধিনাশ হলে বউকে মা ডাকাও আশ্চর্যের নয় ব্রাদার। তোমার ঘুমের বড়ি একটা দিয়ো তো।

ঘুমের চিন্তা পরে। এখন মেয়ের কথা ভাবো।

ভাবছি, ভাবছি। না ভেবে উপায় কী! তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে পারলে—

সেইখানেও কথা আছে। ও জহ্নুকে পছন্দ করছে না। কেন বলো তো!

সে কী! কেন?

সেটা তোমার মেয়েই জানে। আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন শাসন করতে ভয় পাও।

বাঁধনকে তো শাসন করার কোনও দরকার হয়নি। তেমন অবাধ্য বা জেদি মেয়ে তো নয়! অপছন্দের কথাটা কি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে?

না। হেঁয়ালিতে বলছে। তবে যা বলছে তাতে বোঝা যায় এই বিয়েতে ও রাজি নয়। আর আমার সন্দেহ, এই অপছন্দের কারণ হল শিশির। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে যা বাবারা পারে না।

নেশাটা প্রায় কেটে যাচ্ছে বেদব্যাসের। সে তাড়াতাড়ি গেলাস শেষ করে আবার ঢালল। বলল, তুমি নেবে?

দাও। মাথাটা ভার লাগছিল, ছেড়ে গেছে।

আরে খাও, খাও, দিল খুলে খাও। টেনশনে খুব হেল্পফুল।

কিছুক্ষণ নীরবে পান করার পর বেদব্যাস খুব মিয়োনো গলায় বলে, হ্যাঁ গো, তোমার কোথাও রিডিং-এ ভুল হচ্ছে না তো! এমন তো হতেই পারে বাঁধন আউট অফ কাইন্ডনেস শিশিরের বাড়িতে যায়। হয়তো সম্পর্কটা নেহাতই স্নেহ এবং শ্রদ্ধার।

দুনিয়াটা সেরকম হলে আর আমাদের দুশ্চিন্তার কী ছিল বলো! শিশির ওকে ক্লাস টেন অবধি অঙ্ক শিখিয়েছে। তারপর তো আর রিলেশনটা এত দিন টেনে আনার মানে হয় না। তাহলে সম্পর্কটা আছে কেন আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? আগে মাঝে মাঝে যেত, শিশিরের বউয়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করে আসত। কিন্তু আজকাল রোজ যায় এবং অনেকক্ষণ থাকে। ওর এত মাথাব্যথা কিসের যে, শিশিরের বাচ্চা সামলাবে? বাড়িতে তো এক গেলাস জলও গড়ায় না। তাহলে শিশিরের হেঁসেলে গিয়ে রেঁধে আসে কেন?

না, মাথাটা বড্ড গরম লাগছে। কালই প্রেশারটা চেক করাতে হবে।

প্লিজ, অ্যাজিটেটেড হোয়ো না। তোমার শরীর খারাপ লাগবে জানলে আমি কথাটা তোমাকে বলতাম না। চলো, ঘরে গিয়ে বাতি নিবিয়ে চুপচাপ একটু শুয়ে থাকবে।

না, ঘরে গেলে দম আটকে আসবে। খোলা হাওয়াই ভাল। বয়স হলে টেনশন নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় তো।

তোমাকে আবার বয়সে পেল কবে থেকে? বয়স তুমি মানো নাকি?

হঠাৎ এখন মনে হচ্ছে, আমার বয়সটা এক লাফে অনেকটা বেড়ে গেল বুঝি!

তোমার মস্ত দোষ হল, তুমি মেয়েদের আদর দাও, কিন্তু ভাল করে লক্ষ করো না। তুমি ধরেই নাও যে, আমার মেয়েরা সব ঠিকঠাক আছে, পড়াশুনো করছে, বড় হচ্ছে, কোনও গণ্ডগোল নেই। কিন্তু লক্ষ করলে বুঝতে পারতে খুব ছোটখাটো ব্যাপারের ভিতর দিয়েও অনেক গোপন খবরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

হ্যাঁ, সেটা বোধহয় ভুলই হয়েছে। কিন্তু সমস্যার কথা বললেই তো হবে না। হাউ টু সলভ ইট?

তোমার যা অবস্থা দেখছি, তুমি তো মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলতে পারবে না। নার্ভ ফেল করবে। অত ভেবো না, যা বলার আমি সময় সুযোগ মতো বলব। শুধু বলি নিজের বউয়ের ওপর একটু নির্ভর করতে শেখো। মেয়েমানুষ বলে অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোরো না।

থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।

এখন এসব গেলা বন্ধ করে আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ো তো! তোমাকে ভীষণ অস্থির লাগছে। আমি বরং তোমার এসিটা চালিয়ে রেখে আসি।

এই শেষ ড্রিংকটা নিয়েই উঠছি। শিবুকে খাবার দিতে বলো। কিন্তু মাত্র যে সাড়ে আটটা বাজে! এত তাড়াতাড়ি তো ঘুম আসবে না!

ঘুমোতে তো বলছি না। খেয়ে রেস্ট নাও। চোখ বুজে শুয়ে থাকাটাও ভীষণ রিফ্রেশিং।

বেদব্যাসের বুকের ভিতরটা একটা অচেনা ভয়ে ধক ধক করছে। ভয়টা সামনের ওই অন্ধকারের মতো। কিছুই দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুমান করা যায় না। অচেনা, অদেখা, অজ্ঞতা থেকেই পা টিপে টিপে ভয়েরা আসে।

রাতের খাওয়াটা ঠিক খাওয়ার মতো হল না। চিকেন স্টু যে এত বিস্বাদ হতে পারে কে জানত! তেমনি রুটি কামড়াতে গিয়ে মনে হল ন্যাকড়া খাচ্ছে। ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল বেদব্যাস। ঘরে এসির মনোরম ঠান্ডায় একা মৃদু নীল আলোর আভায় শুয়ে মনে হল, জলে ডুবে যাচ্ছে বুঝি। বড্ড হাঁসফাঁস। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না, ভীষণ ভীষণ ভুল পথে চলে যাচ্ছে! যদি সত্যিই শিশির ওর মাথা খেয়ে থাকে তাহলে কে ওকে উদ্ধার করবে? হঠাৎ তড়বড় করে উঠে বসল সে। শিশিরকে গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়ালে কেমন হয়? কিংবা যদি খুনই করা যায়?

এই চিন্তায় আরও মাথা গরম হওয়ায় সে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে মাথায় জল থাবড়াল। তারপর ভেজা মাথাতেই

এসে শুয়ে পড়ে বুক আর পেটের অস্বস্তিতে উঃ আঃ করতে করতে এ পাশ ও পাশ করতে লাগল। চোখে জলও আসছে কি? আমার ফুলের মতো মেয়েটাকে রক্ষা করো ভগবান!

কিন্তু ভগবানটা কে? সে তো ভগবান মানে না! না মানুক, তবু যদি ভগবান বলে কেউ থেকেই থাকে, তবে সেই রাসকেলটাকে তো এখনই দরকার!

একটু বাদেই ডোরবেলের শব্দ। বুকটা ছলাৎ করে উঠল বেদব্যাসের। মেয়েটা এল! সর্বনাশ! এখনই হয়তো কথাটা উঠবে, আর মা-মেয়েতে তুমুল লেগে যাবে। সর্বনাশ! সে কানে হাত চেপে কাঠ হয়ে শুয়ে রইল।

বাবা কোথায় মা? বাবাকে দেখছি না কেন?

শরীর খারাপ, শুয়ে আছে।

বাঁধন উত্তেজিত গলায় বলে, শরীর খারাপ! কী হয়েছে বাবার?

সিরিয়াস কিছু নয়। পেটে একটু গ্যাস হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বাবার কাছে যাব।

বলছি তো তেমন কিছু নয়।

মেয়ে শুনল না। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। তারপর নিঃশব্দে এসে শিয়রের কাছে বসে নরম ঠান্ডা একটা হাত তার কপালে আলতো করে রেখে ভারী মায়ায় মৃদুস্বরে ডাকল, বাবা! তোমার কী হয়েছে বাবা? এখন কেমন লাগছে বাবা?

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল বেদব্যাসের। সামলাতে পারল না।

বাঁধন দু'টি হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কপালে গাল রেখে বলল, কী হয়েছে তোমার সোনাবাবা! কী হয়েছে?

বুকটা কেমন করছে রে মা!

দাঁড়াও ডাক্তার ডাকি।

না না। তুই কাছে একটু বসে থাক। তাহলেই হবে। আর কিছু লাগবে না।

না বাবা, ওরকম করতে হয় না। ডাক্তারকাকুকে ডাকলে এক্ষুনি এসে প্রেশারটা চেক করে দেখবেন। নইলে সারা রাত আমার টেনশন হবে। দাঁড়াও, মোবাইলে এখুনি কলটা করি।

বরাবর বেদব্যাস মেয়েদের কাছে নতি স্বীকার করে এসেছে। আর তাতেই তার আনন্দ। মেয়েরা বড় হয়েছে আর বেদব্যাস হয়ে গেছে তাদের শিশু। এই দ্বিতীয় শৈশব আর এই নতুন মা এত কাল তার সব আনন্দের উৎস ছিল। ভগবান, রক্ষা করো ওকে।

ডাক্তার ভট্টাচার্য এলেন মিনিট পঁচিশের মধ্যেই।

কী মশাই, কী বাঁধালেন দেখি। মেয়ের জরুরি তলব কেন?

বেদব্যাস কাহিল মুখে বলে, ওদের বাড়াবাড়ি। মনে হয় পেটে একটু গ্যাস ফর্ম করেছে।

গ্যাস ফর্ম করাটা খুব ভাল ব্যাপার তো নয়। দেখি পালস।

পালস, হার্ট, প্রেশার সবই দেখা হল। ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে বললেন, তেমন কিছু নয়। তবে প্রেশারটা বর্ডার লাইনে আছে। একটা সেডেটিভ দিয়ে যাচ্ছি, খেয়ে ঘুমোন। দিন দুই পর প্রেশারটা আবার দেখতে হবে। নুন আর স্পাইসি ফুড, রেড মিট একদম খাবেন না।

সব ডাক্তারই একটাই পার্ট মুখস্থ বলে যায়। এসব আজকাল কে না জানে? জানে, তবু খায় এবং ডাক্তাররা বারণ করেই যেতে থাকে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যেমন আর কী।

ডাক্তারের দিয়ে যাওয়া সেডেটিভটা খেল বেদব্যাস। এবং যতক্ষণ না ঘুমোল ততক্ষণ তার শিয়রে বসে তার মুখের দিকে অপলক চেয়ে, কপালে একখানা হাত ছুঁইয়ে বসে রইল বাঁধন। কী মায়া, কী গভীর মায়াময় এই জন্ম, এই বেঁচে থাকা, এই বাবা হওয়া, এই মেয়ের কাছে শিশু হয়ে যাওয়া! ঘুমের আগে সে অস্ফুট বলতে চেষ্টা করল, তোর জন্য আমি পৃথিবী টাল-মাটাল করে দিতে পারি....নিষ্কণ্টক করে দিতে পারি সব পথ....সব বদমাশ, চরিত্রহীনদের তাড়িয়ে দিতে পারি দেশ থেকে....

গভীর ক্লান্তি বিষাদে ঘুম ভাঙল বেদব্যাসের। উঠে দেখল সাহেবের মতো ফর্সা রোদ তাদের খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রেকফাস্টে বসতেই কৃষ্ণা বলল, কাল রাত্রি দেড়টা অবধি মেয়ে তোমার শিয়রে বসে ছিল। কী কাণ্ডই যে করো না তুমি! সামান্য প্রবলেমে এত ভেঙে পড়তে হয়! আমি তো ভয়ে মরি, কী না জানি হয়ে গেল তোমার!

বেদব্যাস অবাক হয়ে বলল, দেড়টা! অতক্ষণ বসে ছিল কেন মেয়েটা!

ওদের সর্বস্ব তো তুমি!

বেদব্যাস টোস্ট আর ডিমের দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, কৃষ্ণা, আই রিয়েলি ফিল লাইক বিয়িং ওল্ড।

বুড়ো হও ক্ষতি নেই। বুড়িয়ে যেয়ো না দয়া করে।

কাল না পরশু কবে যেন কাঁকনও বলছিল, বাবা তুমি তো বুড়ো হয়েছ, না?

হঠাৎ ওকথা বলার মানে কী?

সেটা বড় কথা নয়। কথা হল, আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

আচ্ছা, বুড়ো হওয়ার সময় পাবে। এখন খাও পেট ভরে। কাল রাতে তো কিছুই খেলে না!

তিন

একজন হ্যাপি ম্যানের যা যা লক্ষণ আছে, মৃদুল মিলিয়ে দেখেছে, সবই তার সঙ্গে মেলে। কিছু খিঁচ আছে বটে, তা সত্ত্বেও নিজেকে তার হ্যাপি ম্যান মনে করতে তেমন কোনও অসুবিধে নেই। এই বাড়িটার কথাই ধরা যাক। আনোয়ার শা কানেকটারে দক্ষিণ খোলা এবং রাস্তার ওপরেই প্রায় দোতলা বাড়ি। হুল্লোড় হাওয়ায় বাড়িটা সারা দিন যেন ওড়ে। বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে একটু বাঁ দিকে তাকালেই, দূরে ওই বাইপাস। বেসমেন্ট থেকে ছাদের দরজা অবধি মার্বেল। অতি পোক্ত এবং বাছাই দরজা, জানালা এবং গ্রিল। কোথাও ড্যাম্প নেই, উই নেই, প্রতিটি ফাঁক-ফোকরে মসকুইটো নেট। সামনে আট ফুট বাই ষাট ফুট জমিতে একটু মহার্ঘ বাগানও। বাড়ি হচ্ছে হ্যাপিনেসের পয়লা সিঁড়ি।

তারপর সন্তান! দুটোই স্মুদ। একটা ছেলে তো একটা মেয়ে। দুটোই নর্মাল ডেলিভারি। ভগবান একেবারে মেপে দিয়েছেন। মধ্যবিত্তের দু'টি দুশ্চিন্তা—মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি। মৃদুল দুশ্চিন্তাটা করার ফাঁকই পেল না। দিব্যি ভাবসাব করে স্বজাতি একটি ছেলেকে পটিয়ে ফেলে একদিন নিয়ে

এল বাপের কাছে, যেন দড়িতে বাঁধা একটি পুরুষ্ট দুধেল গাই। মসৃণ বিয়েটা হয়ে গেল, ক্যাটারারের সাড়ে তিনশো টাকার প্লেট নিয়েও ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। কৃতী বাবাজীবন এখন আমেরিকায়, ট্যুরে। তবে পাকাপাকি ওখানেই ঠেক হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। বুদ্ধিমতী মেয়েটিও শ্বশুরবাড়িটিকে মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। আর ছেলে! ইংরিজিতে ভাল পাশ দিয়ে স্লেট নেট সব ডিঙিয়ে গেল অনায়াসে। অধ্যাপনা ছেড়ে খবরের কাগজে ঢুকেছে। কাগজে নামটাম বেরোচ্ছে এবং চমৎকার ভদ্রস্থ বেতন। মানুষ আর কত চাইবে?

হ্যাপি ম্যানের যত লক্ষণ সবই মিলিয়ে দেখে মৃদুল চক্রবর্তী এবং ততই তার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। তা হাসেও মৃদুল। তিনতলা ছাদে উঠে সকালবেলায় কিছু হালকা ব্যায়াম সেরে কিছুক্ষণ দ্রুত পায়চারি করার পর কোমরে হাত রেখে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে হাঃ হাঃ করে হাসে। লাফ থেরাপি। হার্ট ভাল থাকে, ফুসফুস তাজা হয়, ডিপ্রেশন থাকে না। ওসব অবশ্য তার নেইও। আর তার হাসিটা শুধু ব্যায়ামই নয়, আনন্দের প্রকাশও। ওই হাসিটার মধ্যে তার সাকসেস স্টোরিও আছে।

বাকি থাকে বউ। হ্যাপিনেসের মস্ত শত্রু হল বিরূপ বউ। তা মৃদুলের ভাগ্যাকাশ বরাবরই নির্মেঘ। কখনও রোদে ঝলমলে, কখনও জ্যোৎস্নায় বাঁধ ভাঙো-ভাঙো। সুশ্রী চিত্রাঙ্গদা ছিল তার অফিসেরই রিসেপশনিস্ট, যাতায়াতের পথে মিষ্টি হাসি বিনিময় হত। লম্বা চওড়া এবং আত্মবিশ্বাসী মৃদুলকে মেয়েরা বরাবর পছন্দ করেছে। চিত্রাঙ্গদাও করল

এবং একটু বেশিই করে ফেলল। জানা গেল, চিত্রাঙ্গদারা ভট্‌চাজ বামুন। এসবই মেড ইন হেভেন। এত খাপে খাপ কেদারের বাপ না হলেও হত। কিন্তু মৃদুলের ক্ষেত্রে এরকমই হয়ে এসেছে বরাবর।

আজ সকালে রোজকার মতোই মৃদুল জানালার ধারে তার আরামদায়ক ডেক-চেয়ারে বসে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নিজের হ্যাপিনেসের কথাই ভাবছিল। রোজই ভাবে।

সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটতে শুরু করেছে বলে আজ সকালে দক্ষিণের জানালা দিয়ে কুমড়োর ফালির মতো এক চিলতে রোদ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকেছে। ভারী বিনয়ী, অমায়িক, রোগা এবং নিরীহ একটু রোদ। মৃদুলের অর্ধেক মাথায় রোদ্দুর আর অর্ধেকটায় ছায়া। এই রোদ আর ছায়ার আশ্চর্য রসায়নেই বোধহয় আজ হঠাৎ তার মাথায় একটা ঘুমন্ত সত্যের জাগরণ ঘটল। সে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে সত্যটাকে অনুভব করল। সত্যটা হল এই যে, হ্যাপিনেসের ধ্রুপদী লক্ষণ হল অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে না ভাবা। অতীতের গ্লানি এবং ভবিষ্যতের নানা অনিশ্চয়ের আশঙ্কা—এ দুটোই হ্যাপিনেসের চূড়ান্ত শত্রু। অধিকাংশ মানুষই এই অতীত আর ভবিষ্যতের চিন্তায় খরচ হয়ে যায় বলে বর্তমানের সুখটাকে টেরই পায় না।

সত্যের এই আকস্মিক ঝলকানিতে চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বলেই সামনে হঠাৎ উদয়-হওয়া লোকটার মুখ সে ভাল করে দেখতে পেল না। তবু সেই লোকটাকেই প্রশ্ন করল, ঠিক কি না?

মহীতোষ সামনের মুখোমুখি সোফাটায় বসতে বসতে ভারী মোলায়েম গলায় বলে, কাকা, আইজও কি মাথায় ক্যাড়া চাড়া দিচ্ছে?

ব্যাপারটা লজ্জার। মৃদুল সবেগে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অপ্রস্তুত হয়ে বলে, আইজ মাথায় আৎকা একটা আইডিয়া আইল, বুঝলি!

বুঝলাম। তোমার মাথায় তো হরবখত আইডিয়া আইতাছে। টঙ্গ থিক্যা এইবার নীচে লামো তো!

ক্যান, কী হইছে? আরে বয়, বয়, জুইৎ কইরা বয়। তারপর বৃত্তান্ত ক'।

বৃত্তান্ত খুব খারাপ। মাই ডেজ আর নামবারড।

ক্যান রে, কী হইছে?

তুমি স্বপ্নটপ্ন দ্যাখো?

স্বপ্ন? নাঃ। আমার খুব সাউন্ড স্লিপ, বুঝলি!

অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ ক্লাসিক সিমটম অফ হ্যাপিনেস। হ্যাপি ম্যানরা স্বপ্ন দেখে না ক্যান জানো? তারা স্বপ্নরে অ্যাচিভ করে, কনভার্ট দেম ইনটু কংক্রিট সাকসেস।

তর মতলবটা কী?

কইলাম তো, মাই ডেজ আর নামবারড। কাইল রাইতে আমি পোস্ট অফিসের স্বপ্ন দেখছি।

পোস্ট অফিসের স্বপ্ন! হেইটা আবার কী? পোস্ট অফিসের স্বপ্ন দেখলে কী হয়?

তুমি যদি কখনও পোস্ট অফিসের স্বপ্ন দ্যাখো তা হইলেই বুঝবা যে, তুমি আর বেশি দিন নাই।

দূর নির্বইংশার পো, তর মাথায় ক্যাড়া ঢুকছে।

ঢুকব না ক্যান? তোমারই তো ভাইস্তা। তবে ড্রিম অফ এ পোস্ট অফিস ইজ ভেরি ব্যাড। তুমি তো জীবনে দুঃস্বপ্ন দ্যাখো নাই।

একবার মাকালীর স্বপ্ন দেইখ্যা ডরাইছিলাম। বহু কাল আগে।

মাকালী ইজ ফার বেটার দ্যান পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিস ইজ নেমেসিস!

তর মাথা! পোস্ট অফিসের সিগনিফিক্যান্স কী?

খুব ডিপ সিগনিফিক্যান্স আছে।

গুল্লি মার তো! আই ডোন্ট বিলিভ ইন ড্রিমস। তরা যেমন কম্পিউটারের চাক্কি সাফ করস, তেমন কইরা মুইছ্যা ফালাইয়া দে।

মেমোরি ডিস্ক ডিলিট করা যত সোজা, মানুষের মেমোরি ডিলিট করা তেমন সোজা কাম পাও নাই।

আরে আমি তো কই, যদি হ্যাপি থাকতে চাও তা হইলে অতীত আর ভবিষ্যৎ লইয়া ভাইব্যো না। প্রেজেন্ট টেন্স লইয়া থাকো।

এইটা কী কইলা কাকা?

ক্যান, খারাপ কইলাম নাকি? আইজ সকালেই তো এই আইডিয়াটা মাথায় আইল।

শোনো কাকা, অতীত হইল হিস্টরি। তার মানে হইল এক্সপিরিয়েন্স। আর ভবিষ্যৎ মানে হইল প্ল্যানিং। তোমার যদি এক্সপিরিয়েন্স এবং প্ল্যানিং না থাকে তা হইলে তো তুমি একজন আত্মবিস্মৃত এবং অদূরদর্শী লোক। তারে মাইনসে

পাগল কয়। আর পাগলের গো-বধে আনন্দ।

দূর হারামজাদা, সকালে আইয়াই পোস্ট অফিস খুইল্যা বইছে। মাথায় ক্যাড়া না থাকলে কি আর কেউ দিবাস্বপ্ন লইয়া মাথা ঘামায়?

স্বপ্ন তো দ্যাখলাম শ্যাষ রাইতে, হেইটা দিবাস্বপ্ন হইল ক্যামনে?

সব স্বপ্নই দিবাস্বপ্ন। আজ রাইতে ইসবগুল খাইয়া শুইস। তর প্যাটে বায়ু হইছে।

মহীতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার কথারে কেউ গুরুত্ব দেয় না ক্যান জানো? আমি ব্যাচেলর বইল্যা। ব্যাচেলারগো মাইনসে নাবালক মনে করে।

তা হইলে তর ব্যাচেলার থাকনের কামটা কী রে দামড়া? চোর-ডাকাইতেও তো বিয়া করতাছে।

আর বিয়া! আফটার দ্যাট পোস্ট অফিস ড্রিম অখন বিয়ার নাম শুনলেও পাপ। বোঝলা!

তুই কি জানস যে, তর লগে কিছুক্ষণ কথা কইলেই আমার মাথা ঘুরায়?

যেই কথাটা কওনের লিগ্যা এই সকালে কড়েয়া থিক্যা এত দূর দৌড়াইয়া আইছি হেইটা শুনলে তোমার মাথা আরও ঘুরাইব।

বাকি রাখলি কী? কইয়া ফালা।

রিগার্ডিং জহ্নু। হি ইজ অ্যাডামেন্ট।

ক্যান, মাইয়া পছন্দ হয় নাই নাকি?

বরং উল্টা। বেশি পছন্দ হইছে।

তা হইলে?

হেইটাই তো কথা। কয়, অত সুন্দরী মাইয়া আমাগো ঘরে মানাইব না। মাইয়া নাকি এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। আমেরিকার লিগ্যা জন্মাইছে।

উঃ তরা তো আমারে পাগল কইরা ছাড়বি!

এমন সুন্দর, নরম সরম মাইয়াটা। এই বাড়িতে মানাইতও ভাল। এই সুন্দর বাড়ি, সুন্দর গৃহসজ্জা, সুন্দর সব মানুষজন, খুব ফিট করত কাকা।

আমি আবার সুন্দর হইলাম কবে?

তা তুমিই বা খারাপ কী কও? হইতে পারে তোমার রংটা একটু কালা, নাকখান চাপা, গালে মাংস বেশি, বুশি আই ব্রাউজ অ্যান্ড কুতকুতে চোখ। তবু—

জুতা দ্যাখছস হারামজাদা? একেবারে জুতাইয়া দিমু!

আহা, চেইত্যা যাও ক্যান? চেহারা ধুইয়া কি জল খাইবা? আমি কই, ডিউটিফুল ইজ বিউটিফুল। তুমি কুচ্ছিত ঠিকই, তবে ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড বিউটি। যাউকগা, অখন জহ্নুরে একটু ধ্যান দাও। হি ইজ দি প্রবলেম।

আইজকাইল পোলামাইয়াগুলিরে বুইঝ্যা ওঠোনই মুশকিল। একটু এক্সপ্লেইন কইরা ক' তো!

অখনই হাল ছাইড়ো না। রাইট অফ করে নাই। হি ইজ ব্রুডিং।

তর কাকি জানে?

আরে কাকিরে কওনের লিগ্যাই তো আইছিলাম। কিন্তু হ্যায় তো মর্নিং ওয়াক-এ গেছে। জহ্নু কই? অখনও ওঠে নাই?

আরে, তার লাগুড় পাওনই কঠিন। পরশু দিল্লি গেছে, শনিবার রাইতে নাকি ফিরব। আমারে তো কিছু কয় না, তার যত কথা তার মায়ের লগে।

হ্যাপিনেসটা এই একটু আগেও একটি সুঘ্রাণ শিশুর মতো তার গলা জড়িয়ে ধরে যেন হামি দিচ্ছিল। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, হ্যাপিনেস নিমাইয়ের মতো হঠাৎ সন্ন্যাস নিয়েছে। আসলে দুর্গাপুরের মেয়েটাকে বড়ই ভাল লেগেছিল মৃদুলের। কী নরম সরম কথাবার্তা আর ব্যবহার। চোখ দু'টি মায়ায় ভরা। ফ্যামিলি রেফারেন্সও চমৎকার। মানস আর কেয়া দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছে। আজকাল অচেনা অজানা ঘর থেকে মেয়ে আনা রিস্কি। পান থেকে চুন খসলেই চারশো আটানব্বইতে ফাঁসিয়ে দেবে।

মহীতোষ চলে যাওয়ার পর উদ্বিগ্ন মৃদুল ফোন করল তাজুকে।

শুনেছিস কিছু?

কী শুনব?

তোর দাদা নাকি দুর্গাপুরের মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইছে না!

কে বলল?

মহী বলে গেল এইমাত্র। জহ্নু তোকে কিছু বলেনি?

না তো!

আশ্চর্য! তোকেই তো ও সব বলে!

অভিমানে থমথমে গলায় তাজু বলে, আমাকে আজকাল কিছু বলে নাকি দাদা? বিয়ের পর থেকেই আমাকে একদম পর

করে দিয়েছে। আমার চেয়ে মহীদা ওর আপন হল? কী বলেছে মহীদাকে শুনি!

সেও গোলমেলে কথা। বলেছে অত সুন্দরী নাকি আমাদের ঘরে মানাবে না! এমন অদ্ভুত কথা শুনেছিস? তোর মা কি কম সুন্দরী? না কি তুইই কিছু ফ্যালনা!

দাঁড়াও, আজই আমি মোবাইলে ওকে ধরছি। এমন ঝগড়া করব না যে, সুড়সুড় করে কথা গিলবে।

আমরা মনস্থির করে ফেলেছি। ওদের একরকম জানানোও হয়ে গেছে। এখন কেঁচে গেলে বিচ্ছিরি হবে।

হাত থেকে কখনও সখনও মোবাইল ফোন পড়ে যেতেই পারে। যায়ও। ঘটনা তো এমন কিছু নয়। তবু মাঝে মাঝে সেই পড়ে-যাওয়া ফোন থেকে উঠে আসতে পারে কোনও ভুলে-যাওয়া বসন্তকালও।

এমনটাই হল এক সকালে। চিত্রাঙ্গদা তখন কানেকটারটা পার হয়ে বড় রাস্তা ডিঙিয়ে ছোট লেকটার মুখোমুখি। মুঠোয় ধরা ফোন। সেটা ছিল দু'বছর আগে কুয়াশায় সম্মোহিত এক শীতের সকাল। ডিসেম্বরের তিন তারিখ। দিনটা ভোলার নয়।

খুব দীর্ঘাঙ্গিনী নয় চিত্রাঙ্গদা। শরীর কৃশ। বরাবর একটু ছোটখাটো বলে পঞ্চাশেও কিশোরীপ্রতিম বলে ভুল হয়ে থাকে। কিংবা ভুলই বা কেন? যদি কারও কৈশোরকাল এত দূর চলে আসে তাহলেই বা কী করার আছে! একটা ভেলভেটের ক্লোক ছিল গায়ে আর হাঁটতে সুবিধে হবে বলে সালোয়ার

কামিজ। সকালের এই সামান্য ভ্রমণটুকুর জন্য বিশেষ সাজে না সে। সাজার দরকারও নেই তার।

একটু আনমনা ছিল বোধহয়। একটা সামান্য ধাক্কা লেগেছিল কাঁধে। কর্কশ পরুষ ধাক্কা নয়। সামান্য অসাবধানী চকিত স্পর্শের মতোই। ফোনটা স্খলিত হাত থেকে খসে গিয়েছিল। ঘুরে লোকটার দিকে চাইতে গিয়ে একটু অপ্রস্তুত।

তিনি হাতজোড় করে বললেন, মাপ করবেন, আমারই দোষ।

বলে ফোনটি কুড়িয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ডান চোখে আমি কিছুই দেখতে পাই না, তাই মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়।

কিছু মনে করেনি চিত্রাঙ্গদা। রাস্তায় ঘাটে এরকম তো হয়। সে করুণাবশে বলেছিল, দেখতে পান না! আহা রে!

চোখে থ্রম্বসিস। আইসাইট নিল। তিন মাস চলছে। ডাক্তার বলছে সামান্য সাইট রিগেন করতেও পারি। সময় লাগবে।

এই বয়সে থ্রম্বসিস?

চোখে নাকি হয়। ব্রেনে হলে আরও একটু বিপদ ছিল।

জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। খুব অনায়াস, আড়ষ্টতাহীন পরিচয়। একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসলও তারা।

আপনি তো বিবাহিতা, না?

হেসে ফেলেছিল চিত্রাঙ্গদা, বিবাহিতা মানে? আমার ছেলের বয়স সাতাশ, মেয়ে তেইশ।

মাই গড! ইউ লুক সো ইয়ং!

পুরুষরা এরকম সব অসম্ভব কমপ্লিমেন্ট মেয়েদের দেয়

বটে, কিন্তু চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে যে সেটা নয় তা সে ভালই জানে। তাকে কমবয়সি মেয়ে বলে অনেকেই ভুল করে।

প্রথম দিনের আলাপটাই ছিল তাদের নিয়তি। রোজ তারা জুটি বেঁধে হাঁটতে লাগল, বসতে লাগল, কথা বলতে লাগল এবং কথা হতে লাগল অফুরান।

বিয়ে করেছ জয়ন্ত?

হ্যাঁ।

ছেলেপুলে?

হয়নি।

ঝাড়া হাত-পা?

একটু নিঃসঙ্গ লাগে, এই যা।

এক্স-প্যারাট্রুপার, এক্স-মাউন্টেনিয়ার, এক্স-স্পোর্টসম্যান তেতাল্লিশ বছরের শক্তসমর্থ জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে আটচল্লিশ বছরের চিত্রাঙ্গদার মধুর সাক্ষাৎকারটি ক্রমে মধুরতর হতে লাগল। এটা বাঁধনছেঁড়া প্রেম নয় বটে, তবে ফ্রিঞ্জ বেনিফিট। পরিবারের সুদৃঢ় ভিত অটুট রেখে, স্বামী-সন্তানের সঙ্গে বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেও এই একটু ছেনালিপনা যেন সামান্য মুক্তির বার্তাবহ।

কোথাও সন্দেহ দানা বাঁধেনি, ভ্রু-কুঞ্চন দেখা যায়নি, ফিসফাস হলেও তা কানে আসেনি। এমনকী তার প্রাতর্ভ্রমণের সঙ্গীটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মৃদুল, জহ্নু এবং তাজুর সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে চিত্রাঙ্গদা। খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী বলে জয়ন্তর বাড়িতে কখনও যেতে চায়নি। সে নিজে মেয়ে বলে মেয়েদের চেনে।

জয়ন্তকে বলেছে, কমপ্লিকেশন বাড়িয়ো না।

সম্পর্কটা খোলামেলা বটে, কিন্তু ভিতরে একটা গুপ্ত আনন্দের চোরাস্রোত আছে। শরীরের সম্পর্ক ব্যাপারটা তত জ্বালাতনের নয়। মাঝে মাঝে আচমকা শরীরের সম্পর্ক হয়ে যেতেও পারে। তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কারণ শরীরের তো মন নেই। কিন্তু শরীর হল না, মন ঝুঁকল, তার ক্রিয়া বহু দিন বহু মাস থাকে। জ্বালায়, ভাবায়, উত্তেজিত, আনমনা, অনুতপ্ত, পাপগ্রস্ত করে রাখে। চিত্রাঙ্গদার আজকাল মনে হয়, শরীরের পাপ ততটা নয়, যতটা মনে পাপ।

আজকাল তাই তার মর্নিং ওয়াক একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফেরার সময় এই নতুন এলাকায় অলিতে-গলিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী বাজারে একটু কেনাকাটাও করে দু'জন। লোকে তাদের স্বামী-স্ত্রীই ভাবে বোধহয়। ভাবুক। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে যখন মুখ টিপে অর্থবহ হাসি হাসে তখন কিছুক্ষণের জন্য কি তারা স্বামী-স্ত্রীই হয়ে যায় না!

এই টনিকটুকুর বড় দরকার ছিল চিত্রাঙ্গদার। অভ্যাসের জীবন কাটাতে কাটাতে এই যে একটু পথ বদলে অচেনায় ঘুরে আসা, মানুষের জীবনে এও ভিটামিনের কাজ করে বোধহয়। হৃৎপিণ্ডের বেগ বাড়ে, আড্রেনালিন প্রবাহিত হয়, ভিতরে ঘটে এক পুনরুজ্জীবন।

আজকাল খুব ভোরে, অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়ে চিত্রাঙ্গদা। বাড়ির সবাই অঘোর ঘুমে। ছোট লেক জনমানবহীন। তারা দু'জন ফাঁকা বেঞ্চে হাত ধরাধরি করে বসে থাকে। মাত্র কয়েক দিন আগে তাকে চুমু খেয়েছিল জয়ন্ত। অনেকক্ষণ

ধরে। তারপর রোজই সেটা হচ্ছে। খুব ভোরে।

এইটুকুই উন্মোচন তাদের। এর বেশি তেমন কিছু নয়। এটুকু তো হতেই পারে। তাই না?

বাড়িতে ফিরে প্রথমে তার মিনি বাগানের প্রতিটি গাছকেই ভাল করে দ্যাখে চিত্রাঙ্গদা। ওদেরও রোজ শরীর ভাল যায় না। লক্ষ রাখতে হয়। কে রোগা হচ্ছে, কে বুড়িয়ে যাচ্ছে তার হিসেব রাখে সে। কয়েকটা আছে দামাল গাছ, পরিচর্যা ছাড়াই লকলক করে বেড়ে ওঠে, কয়েকটা একটু সুখী, মিহিন, আদুরে স্বভাবের। তাদের যথাযথ আদর দিতে হয়।

বাড়িতে ঢুকলেই সে ফের মৃদুল চক্রবর্তীর চিহ্নিত গৃহিণী। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনি মঙ্গলাকে গাইডলাইন ধরিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে ওপরে ওঠা। ঠাকুরঘরে একটা প্রণাম। তারপর শুরু হয় তার দৈনন্দিন।

আজ ওপরে উঠতেই মুখোমুখি মৃদুল।

শুনেছ?

কী হল?

তোমার ছেলে কী বলেছে শুনেছ?

কী বলেছে?

দুর্গাপুরের মেয়েটাকে নাকি বিয়ে করবে না।

একটুও অবাক না হয়ে চিত্রাঙ্গদা বলল, এই সাতসকালে কে তোমাকে এ খবর দিয়ে গেল? মহী নাকি?

কী করে জানলে? রাস্তায় দেখা হল বুঝি?

না তো! আন্দাজ করলাম।

আন্দাজ করলে!

মহী আমাকে পরশু ফোন করেছিল।

তাহলে এখন কী করবে?

উত্তেজিত হওয়ার মতো ব্যাপার নয়।

বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলো।

দাঁড়াও, একটু বাথরুম থেকে আসি। যা গরম।

মৃদুল চক্রবর্তী হল তার পড়া বই। লোকটার মলাট থেকে শেষ পাতা অবধি বহুকাল আগেই পড়ে ফেলেছে সে। একসময়ে বড় কোম্পানির ল-অফিসার ছিল। এখন কোম্পানি ল-কনসালট্যান্ট। কাজের লোক। আর এইসব লোকেরা সংসারের প্যাটার্নটা একদম বুঝতে পারে না। বড্ড ঘাবড়ে যায় সহজেই। আদালতে বড় বড় যুদ্ধ জয় করে আসে বটে, কিন্তু সংসারের সামান্য সমস্যাতেই জুজুর ভয়ে আঁতকে ওঠে।

বাথরুমে একটু সময়ই লাগে চিত্রাঙ্গদার। পরিচ্ছন্ন হয়ে একটা বহুবর্ণ নাইটি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে। সকালের লালাসিক্ত চুম্বনটি ধুয়ে গেছে। এখন সর্বাঙ্গে আর পাপ নেই। মনটা ঘুড়ির মতো উড়ছে।

এবার বলো কী হয়েছে?

মৃদুল হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, তুমি তো জানোই। বিয়ে কি তাহলে ক্যানসেল করে দিচ্ছ?

সেরকম কিছু তো হয়নি!

তাহলে যে মহী হারামজাদা বলে গেল!

জহ্নু বলেছে মেয়েটা বড় বেশি সুন্দর। কথাটা ঠিকই। তা বলে বিয়ে তো এখনও নাকচ করেনি। ওদের মধ্যে ফোনে তো রোজ কথা হয়।

কার সঙ্গে কার?

জহ্নুর সঙ্গে বাঁধনের।

বলো কী? আমাকে বলোনি তো!

বাবাদের এসব জানার দরকার কী?

তুমি কী করে জানলে? আড়ি পেতে শুনেছ নাকি?

না। ও যখন স্নানে যায় তখন ওর মোবাইল চেক করি। দু'জনের রোজ কথা হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে।

বাঃ বাঃ, চমৎকার। দেন ইট ইজ প্রোগ্রেসিং।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে অত সহজে কিছু বলা যায় না।

আহা, কথাবার্তা যে হচ্ছে, সেটাই তো গুড সাইন!

অত টেনশন করছ কেন? ওদের বোঝাপড়া করতে একটু সময় দাও।

দিলাম। আর না হয় টেনশন করব না। আচ্ছা, আমরা তো এ সময়ে একবার চা খাই, না?

না, কফি।

ওই হল। আমার কাছে চা-ও যা, কফিও তাই।

তাহলে তোমার চা-কফি কোনওটাই খাওয়ার কোনও মানে হয় না।

হয়। দুধ আর চিনি মনের মতো হলে খেতে বেশ লাগে।

চুপচাপ বোসো। কফি আসছে। মহী কিছু খেয়েটেয়ে গেছে?

নাঃ। ঝড়ের মতো এল আর চলে গেল। তোমাকেই বলতে এসেছিল, তোমাকে না পেয়ে আমাকে বলে গেল।

বাঙালরা সারা দিন শুধু খাই-খাই করে। এই গুচ্ছের কচুর শাক এনে ফেলল, এই একখানা প্রকাণ্ড ইলিশ ঝুলিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ঢুকল, এই খাসির তেল, গলদাচিংড়ি, চিতলের পেটি, না হয় তো একগাদা ডাঁটা ঝিঙে পটল কুমড়ো দিয়ে বাড়ি ভরে ফেলল। এই বাতিক একসময়ে মৃদুলেরও ছিল। ইদানীং হঠাৎ, কারও পরামর্শেই বোধহয়, খেয়াল হয়েছে যে, এই বাড়াবাড়ি খাওয়াদাওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। ব্যস, একদিন হঠাৎ করে খাওয়া কমিয়ে অর্ধেক করে ফেলল। আগে অফিসে যাওয়ার আগে সকালে পেট পুরে ভাত খেয়ে যেত। এখন লাঞ্চ বন্ধ। শুধু দু'খানা আটার রুটি খেয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে কিছুই খায় না। একবারে রাতে এসে ভাত। তাও খুব মেপে।

চিত্রাঙ্গদা তাই নিজেও লাঞ্চ বাদ দিয়েছে। সকালে একটু ফল, দুপুরে দই, রাতে ভাত। বেশ ঝরঝরে আছে তাতে। অনেক হালকা বোধ করে। একতলা থেকে ছাদ অবধি একটু না হাঁফিয়ে তরতর করে উঠে যেতে পারে।

বেলা সাড়ে ন'টায় গাড়ি নিয়ে মৃদুল বেরিয়ে যাওয়ার পর চিত্রাঙ্গদা ইন্টারনেটে শেয়ার বাজার খুলে বসে গেল রোজকার মতো। তার দশ-বারো লাখ টাকা শেয়ারে খাটছে। রোজই কিছু বিকিকিনি থাকে তার। লাভ লোকসানের চেয়েও অনেক বেশি হল এর নেশা। সময় এত ভাল কেটে যায় যে, বলার নয়।

মোবাইলে পাখির কিচিরমিচির শুনে আনমনে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে মোবাইলটা টেনে নিল সে।

হ্যাঁ, বলুন।

আমি প্রণতি বলছি।

প্রণতি! কে প্রণতি বলুন তো!

আমি জয়ন্ত রায়ের স্ত্রী।

একটু অবাক হয়ে চিত্রাঙ্গদা বলে, ওঃ, জয়ন্তবাবুর স্ত্রী! বলুন ভাই!

আমি ওর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

আমার আবার কী কথা ভাই? বাঙালি ঘরের সাদামাটা বউ।

সে তো আমিও। একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

আমি তো ভেবেছিলাম, পথের বন্ধুত্ব পথেই থাকুক, বাড়ি বয়ে নিয়ে যাব না।

তা কেন? উনি তো আপনাদের বাড়িতে যান।

একটু হাসল চিত্রাঙ্গদা। বলল, তা অবশ্য আসে মাঝে মাঝে।

আপনিও আসুন না একদিন। বেশি দূরে তো নয়।

ঠিক আছে। বলছেন যখন, একদিন যাব।

আমাকে আপনি বলবেন না। আমি অনেক ছোট।

বেশ। তুমি তো একটা স্কুল চালাও, না?

কিন্ডারগার্টেন। আমার তো ছেলেপুলে নেই। তাই বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আছি।

বাচ্চাদের একটা স্কুল খোলার ইচ্ছে আমারও ছিল। কিন্তু সংসার সামলে আর হয়ে উঠল না।

আমার নিজের ছেলেপুলে থাকলে হয়তো আমিও করতাম না। আমি কি আপনাকে দিদি ডাকতে পারি?

ওমা! কথা শোনো। দিদিই তো ডাকবে!

আপনি তো আগে চাকরি করতেন, না?

হ্যাঁ, চাকরি অনেক দিন করেছি। তারপর আমার বর একদিন আমাকে একটা বদ নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই আর চাকরি করতে ভাল লাগল না।

শেয়ার বাজার তো!

ওমা! তুমি জানো দেখছি!

হ্যাঁ। উনি বলছিলেন আপনি নাকি শেয়ার বাজার খুব ভাল বোঝেন।

আজকাল সবাই বোঝে। ফাটকা কে না খেলছে বলো!

আমাকে শিখিয়ে দেবেন?

শেখার মতো হাতিঘোড়া নয়। বাড়িতে ইন্টারনেট আছে তো!

আছে।

তাহলেই হবে। যদি চাও তাঁহলে আমার এজেন্টকে দায়িত্ব দিতে পারো। বাজারে অবশ্য দালালের অভাব নেই।

আমি তো কাউকে চিনি না। তবে আমার কিন্তু বেশি টাকা নেই।

কম টাকাতেও খেলা যায়। টাকাটা বড় কথা তো নয়। আসলে এটা খানিকটা জুয়াখেলাও তো। থ্রিল আছে। সেটাই লাভ।

ছেলের বিয়ের জন্য নাকি পাত্রী খুঁজছেন? আমার একটা ভাইঝি আছে। পরমা সুন্দরী।

তাই? আগে জানাতে পারতে।

আপনার সঙ্গে তো আজই আলাপ হল।

তাও তো বটে।

আপনাদের কি সিলেকশন হয়ে গেছে?

একরকম তাই। দুর্গাপুরের মেয়ে। আমার কর্তার আবার খুব পছন্দ। আমাদেরও। যদি কোনও কারণে এখানে না হয় তাহলে তোমাকে খবর দেব।

ঠিক আছে।

গান জানে?

রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আবার গান-পাগল। সবাই ক্লাসিক্যাল গানের ভক্ত। দুর্গাপুরের মেয়েটা আবার বেশ গজল গায়।

দেখতে সুন্দর?

ভীষণ। সেইজন্যই আবার আমার ছেলের আপত্তি।

ওমা! সুন্দর হলে আপত্তি কী?

পাগল আর কাকে বলে! বলেছে অত সুন্দরী নাকি আমাদের ঘরে মানাবে না।

উনি বলেন, আপনি নাকি ভীষণ সুন্দরী!

জয়ন্তর কথা একদম বিশ্বাস কোরো না। বাড়িয়ে বলেছে।

দুর্গাপুরের মেয়েটার সঙ্গে যদি না হয় তাহলে আমার ভাইঝির কথাটা মনে রাখবেন।

তোমরা কি বামুন?

ও মা! আপনার বন্ধু বামুন কি না তাও জানেন না বুঝি!

লজ্জা পেয়ে চিত্রাঙ্গদা বলে, আসলে আমাদের তো খুব অল্পই কথাবার্তা হয়। হাঁটা বা জগিং-এর সময় কথা বলা

বারণ। বামুন-কায়েত নিয়ে প্রসঙ্গই ওঠে না। রায় পদবিটাও তো গোলমেলে।

ঠিক তাই। তবে আমরা বামুন। আমার বাপের বাড়ি ভট্টাচার্য।

আজকাল ওসব অনেকে মানে না। তবে আমার শ্বশুরবাড়ি আবার খুব গোঁড়া।

আমার আবার গোঁড়াই পছন্দ।

আজ তোমার স্কুল নেই?

না। বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটি থাকে। আমি আবার লক্ষ্মীপুজো করি কিনা।

ঘটা করে করো বুঝি?

না। সেরকম কিছু নয়। তবে সকাল থেকে উপোস থাকি। নিজের হাতে ফলমূল কিনে আনি। বিকেলে ভোগ দিয়ে পাঁচালি পড়ে তবে জল খাই।

শুনে আমারও বেশ লোভ হচ্ছে। কিন্তু হয়ে উঠবে না বাপু।

কেন, শক্ত তো নয়। উপোস করতে পারেন না বুঝি?

উপোসই তো করি রোজ। সকালে একটু শশা, তরমুজ বা ওরকম কিছু। দুপুরে টক দই এক বাটি। সারা দিনে তিন কাপ কফি। রাতে ভাত বা রুটি খাই। উপোসে অভ্যাস হয়ে গেছে।

তাহলে আর শক্ত কী?

এত দিন পুজোপাঠ কিছু করিনি তো! তা বলে আবার নাস্তিক ভেবো না। বাড়িতে বেশ বড় ঠাকুরঘর আছে। তাতে লক্ষ্মীর পটও পাবে। দু'বেলা ফুল, জল, বাতাসা দিয়ে প্রণাম

করি। ব্যস, ওটুকুই। এখন পাঁচালি-টাচালি নিয়ে বসলে ছেলে, মেয়ে, কর্তা সবাই পিছনে লাগবে।

আপনার অবশ্য লক্ষ্মীপুজোর দরকারই বা কী! লক্ষ্মী তো ঢেলে দিয়েছেন।

দূর! জয়ন্ত বলেছে বুঝি! আমরা বাপু একদম ছাপোষা লোক। একদিন এসে দেখে যেয়ো। ভুল ভাঙবে।

আপনাদের বাড়িটা কিন্তু আমি দেখেছি। ভারী সুন্দর বাড়ি। ভাল কোনও আর্কিটেক্টকে দিয়ে করিয়েছেন, না?

বাঙালদের বাড়িঘরের খুব শখ। হয়তো দেশছাড়া হতে হয়েছে বলেই জমি আর বাড়ির ওপর খুব টান। আমার কর্তার এক বন্ধুই প্ল্যান করে দিয়েছে। হ্যাঁ ভাই, তুমি বাঙাল নাকি? আমি কিন্তু ঘটি।

আজকাল আর বাঙাল-ঘটিতে তফাত কী বলুন? আমার বাবার দেশ ছিল ফরিদপুর। সে তো আমি চোখেও দেখিনি। বাঙাল কথাও বলতে পারি না।

ও বাবা! আমার বাড়িতে এসে দেখো। ওদিককার আত্মীয়স্বজন এলে কীরকম নিখাদ বাঙাল ডায়ালগ হয়।

আজ রাখছি দিদি। কেনাকাটা করতে বেরোতে হবে। কবে আসবেন আমাকে একটু ফোন করে জানিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ ভাই। মাঝে মাঝে ফোন কোরো। একা থাকি তো, কথা বললে ভাল লাগে। তোমার নম্বরটা সেভ করে রাখছি।

ফোন রেখে ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবল চিত্রাঙ্গদা। এই ঘনিষ্ঠতা কি ভাল? মেয়েটার সঙ্গে চেনা হলে হয়তো একটা পাপবোধ এসে জ্বালাবে। ব্যাপারটা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে ট্রেডিং-এর

দিকে মন দিল চিত্রাঙ্গদা। দুটো শেয়ার ছেড়ে দিয়ে আজ তার লাভ হয়েছে কুড়ি হাজার টাকার মতো।

মেনোপজের পর শরীরের কিছু কিছু হরমোনের ক্ষরণ বোধহয় বন্ধ হয়ে যায় বা হ্রাস পায়। তা সে যা-ই হোক, সেই সময়ে শরীরে কিছু বিপজ্জনক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যায়। তার ফলে দেখা দেয় ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। চিত্রাঙ্গদা অবশ্য উদাসীন থাকেনি। ঠিক সময়ে ডাক্তারের কাছে গেছে এবং শরীরের যত্ন নিয়েছে। ফলে শরীরে ভাঙচুর হয়েছে খুবই কম। পঞ্চাশেও যুবতী থাকা তার পক্ষে কঠিন হয়নি। কিন্তু শরীরে ভাঁটার লক্ষণ নেই বলেই বোধহয় তার মাঝে মাঝে বিছানায় একজন শক্তসমর্থ পুরুষের শরীর পেতে ইচ্ছে করে এখনও। দলিত, মথিত, লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার ওই ইচ্ছে কি স্বাভাবিক?

এই প্রশ্নটা আজ তাকে গুপ্ত কীটের মতো বারবার কুটকুট করে কামড়াতে থাকে। শক্ত হলেও সে তো একজন বয়স্কা মহিলা এখন! আর কিছু দিনের মধ্যে আরও একজনের শাশুড়ি হবে সে এবং দু'-এক বছরের মধ্যে দিদিমা এবং ঠাকুমাও। মর্যাদার সঙ্গে এখনই কি বুড়ো বয়সের কাছে মাথা নোয়ানো উচিত নয় তার? দরজা খুলে বার্ধক্যকে উদার আহ্বানে ডেকে নেওয়াই কি হবে না বুদ্ধির কাজ?

সকালে বেড়াতে যাওয়ার কি সত্যিই আর কোনও দরকার আছে তার? নীচের তলায় একটা ঘরে সাজানো রয়েছে দু'-দুটো ট্রেড মিল, একটা ম্যানুয়াল, একটা অটোমেটিক। আছে হোম জিম। অ্যাবডোমেন একসারসাইজার। একটা ফোন

করলেই যোগাসন শেখানোর লোক চলে আসবে বাড়িতে।

টুকটুক করে নীচে নেমে জিমনাসিয়ামের ঘরটায় ঢুকল সে। এখন এই ঘরে নিয়মিত জিম করে মৃদুল আর জহ্নু। ক্যালরি পুড়িয়ে, সুগার পুড়িয়ে ফিট থাকার চেষ্টা করে। সে সন্তর্পণে ট্রেড মিলটায় উঠে হাঁটতে শুরু করল। বেশ অনেকক্ষণ হাঁটতে পারলও সে। ডিসপ্লেতে উঠল তিন মিনিট। তারপর ফের হাঁটল, হাঁটতেই থাকল।

চার

উড়োজাহাজের শব্দের ভিতরে কেন এত বিষাদ কে জানে। ক্লান্ত, ধীর, অতি ধীর তার গতি। যেন এই বিপুল আকাশের গাঙ পেরোতে বড় কষ্ট তার। দূর, কেবলই দূর থেকে দূরতরে চলে যাওয়া। ঘরকুনোদের দূরের দিকে ডেকেও যায় বুঝি। বরাবর উড়োজাহাজের পিছু পিছু খোলা মাঠে অনেক দূর ছুটে যেত সে। মনে হত, আর একটু জোরে ছুটলেই তার কাছে হেরে যাবে উড়োজাহাজ। এখন সে আর ছোটে না বটে, কিন্তু তার মন দৌড়ে যায়, সাড়া দিয়ে বলে, যাই!

সেই যাওয়াটা আর হয়ে উঠল না। এই চল্লিশ বছর বয়সে সে যে আর কোনও দূরেই যাবে না কখনও, তা নির্ভুল বুঝে গেছে সে। ভাবলে একটু হাঁফ ধরে যায়। একটু শ্বাসকষ্টের মতো হয়। বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ফেলতে এক অলীক ইচ্ছে জেগে ওঠে ভিতরে।

বাড়ির সামনে এই বিশাল মাঠটা তার তৃতীয় ফুসফুস। একটু অবসর পেলে সন্ধের পর সে মাঠটায় এসে বসে। বিকেলে ফুটবল খেলে গেছে ছেলেরা। তাদের পায়ে মথিত ঘাসের গাঢ় গন্ধ ওঠে বাতাসে। জোনাকি জ্বলে লাখো লাখো। আর একটা

খ্যাপাটে বাতাস ঝাপটা দিয়ে দিয়ে বয়ে যায়। এরোপ্লেনটা তার সাংকেতিক আলো জ্বালাতে জ্বালাতে এখনও চলেছে। গম্ভীর বিষাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। আর কোনও কলকব্জার বোধহয় এত গভীর দুঃখের শব্দ নেই।

উড়োজাহাজ তো কবেই তাকে দিগন্ত পেরোনোর ডাক দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেতে পারল কই শিশির! ডানাহীন শিশির জবুথবু পড়ে আছে এইখানে।

তখন তার সতেরো বছর বয়স। বাড়ির সামনে দিয়ে মর্নিং স্কুলে যেত একঝাঁক ফ্রক পরা মেয়ে। তাদের মধ্যেই ফুটফুটে একটি মেয়েকে একদিন দেখে ফেলল সে। মনে হল, রূপকথা ঘিরে আছে তাকে, মাটিতে পা পড়ছে না, কোথা থেকে অন্য এক অলৌকিক আলো এসে মুখখানাকে আরও একটু উজ্জ্বল করেছে। সেই দেখা আর ফুরোল না, সারাদিন মুখখানা চোখের ওপর ভেসে থাকে, তাকে নিয়ে সারাদিন নানা গল্প রচনা করে যেত সে। ভীষণ রোমান্টিক সব গল্প। মাধ্যমিকে তার র‍্যাংক ছিল একুশ। আর এই ঘটনার পর হায়ার সেকেন্ডারিতে তাকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া গেল না, প্রিয় বিষয় ছিল ফিজিক্স। তাতে কম নম্বর পাওয়ায় অনার্স নিতে হয়েছিল অঙ্কে।

তেরো বছরের সেই ফুটফুটে মেয়েটি এখন কোলনে ক্যানসার নিয়ে পড়ে থাকে ঘরে। তার নির্মোক খসে গেছে কবেই। দু'টি সন্তানের জননী আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে দেয়ালের দিকে। সামনে এখন আর কিছু নেই তার।

উড়োজাহাজটা আজ অনেকক্ষণ ধরে আকাশ পেরোল।

মাঠময় শূন্যতা এবং অন্ধকারের দিকে চেয়ে একটু কেঁপে উঠল শিশির। কব্জির ঘড়িটা দেখে সে উঠে পড়ল। কোচিং ক্লাসের সময় হল। রূপকথা ভেঙে খানখান।

দোষ দেবীরও নয়। দোষ সেই সকালবেলাটার, দোষ সেই বয়সের অবাস্তব মুগ্ধ চোখের. দোষ কাণ্ডজ্ঞানহীন সতেরো বছর বয়সের। তার তেরো বছর বয়সে তার মেকানিক বাবা এক বয়লার দুর্ঘটনায় মারা যান, তার দু'বছরের মাথায় মা। ভাইবোন কেউ ছিল না তার। পাড়া-প্রতিবেশীরাই উদ্যোগ করে বিয়ে দিয়ে দিল। তখন তার বয়স মাত্র তেইশ, দেবীর উনিশ। আজ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরে আর কোনও লাভ নেই। মাথার ওপর উড়োজাহাজ বৃথাই দূরের ডাক দিয়ে চলে যায়। এম আই টি-তে পদার্থবিদ্যায় পিএইচ ডি করতে আর কোনও দিনই যাওয়া হবে না শিশিরের। তাই খুব মন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় সে।

আর মন দিয়ে পড়ায় বলেই তার কোচিং-এর এত নামডাক। বড় দালানটা জুড়ে তার কোচিং ক্লাসে অগুন্তি পড়ুয়ার ভিড়।

এম আই টি-র পিএইচ ডি হতে চেয়েছিলে?— বলে একদিন প্রভাতবাবু অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে ছিলেন তার মুখের দিকে। তারপর বলেছিলেন, এম আই টি বা হার্ভার্ড বা শিকাগোর পিএইচ ডি করতে যাওয়ার দুটো উদ্দেশ্য। এক, জ্ঞানলিপ্সা, দুই, কেরিয়ার। তোমার কোনটা?

শিশির একটু আমতা আমতা করেছিল।

প্রভাতবাবু বললেন, যদি কেরিয়ারের কথা বলো, তাহলে বলি অধ্যাপনা বা গবেষক হওয়া ছাড়া আর পথ নেই। আর

জ্ঞানস্পৃহা যদি বলো, তাহলে পিএইচ ডি না করলেও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বইপত্র, ইন্টারনেট সবই হাতের নাগালে। আমি বলি ওসব চিন্তা করলে ফ্রাস্ট্রেশন বাড়ে। জীবনটা সুখে কাটাতে হলে মানুষের খুব বেশি কিছুর দরকার নেই। শুধু অ্যাটিচুডটা পালটাতে পারলেই হয়। মাসে তোমার রোজগার কত?

তা হয় কিছু।

আমার ধারণা পঁচিশ-ত্রিশ হাজার। ঠিক কি না?

ওরকমই।

তাহলে বাপু, এ দেশের স্ট্যান্ডার্ডে তুমি হাই মিডল ক্লাস। আমিও তো ইংল্যান্ডের পাশ করা লোক, কী এমন হাতিঘোড়া হয়েছি বলো তো! তোমার বরং জব স্যাটিসফ্যাকশন অনেক বেশি। বাচ্চাদের পড়াও, তার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আর পড়ানোর সূত্রেই তুমি এই এলাকায় দারুণ পপুলার। সবাই শিশির মাস্টারকে একডাকে চেনে। ভেবে দেখো, পিএইচ ডি না হয়ে তুমি কিছু কমও হওনি।

শিশির লজ্জার হাসি হেসেছিল। কথাটা মিথ্যে নয়। এমনকী রাজনৈতিক নেতারা অবধি তাকে বহুবার দলে নিতে চেয়েছে। সব ঠিক, তবু মাঝে মাঝে মনটা উদাস লাগে। ওই যে মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে এরোপ্লেন যায়, তখনই কেমন যেন খাঁচা ভেঙে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

পরশু দিনও একটা কেমো হয়ে গেছে দেবীর। যাতায়াতের ধকল গেছে খুব। গোটা রাস্তা অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা। দেবী বলছিল, কেন আর যন্ত্রণা বাড়াচ্ছ

আমার! প্রসন্ন ঘোষের হোমিয়োপ্যাথি ওষুধেই যা হওয়ার হবে।

কী হবে তা এখনও জানে না শিশির। সতেরো বছর বয়সির চোখে দেখা পরির মতো বালিকাটির মুখশ্রী আজও উজান বয়ে আসে। সেই স্মৃতিটাই আজও জ্বালায়।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন শিশিরদা?

শিশির একটু অপ্রস্তুত হয়। মৃদু হেসে বলে, একটু হাওয়ায় বসেছিলাম বাইরে।

বাঁধন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, ওই মাঠে?

হ্যাঁ।

ওখানে আজ বিকেলেই যে গোখরো সাপ বেরিয়েছিল। ছেলেরা মারল।

শিশির নিরুত্তাপ গলায় বলে, তাই! সাপখোপ তো আছেই। কী আর হবে।

আপনার ভীষণ সাহস।

তুমি আবার বড্ড ভিতু।

হ্যাঁ। আমার একটুও সাহস নেই। একটুতেই ঘাবড়ে যাই।

তোমার বাবা এখন ভাল আছেন?

হ্যাঁ। আজ অফিসে গেছে। যত চিন্তা ছিল বাবাকে নিয়ে!

কী হয়েছিল?

প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল। আর হাইপার অ্যাসিডিটি।

একবার দেখতে যাওয়া হয়তো আমার উচিত ছিল। কিন্তু দেখছ তো তোমার বউদিকে নিয়ে কীরকম আছি।

জানি। শিশিরদা, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

বলো।

মা আমাকে আর হুটহাট এখানে আসতে দিতে চাইছে না।

সে কী! কেন?

বিয়ের আগে নাকি এত বেরোতে নেই। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু মা জেদ করছে।

শিশির একটু বিবর্ণ মুখে বলে, সারাদিনে তোমাকে একবারটি না দেখলে আমি থাকব কী করে বাঁধন?

সে তো জানি। আজ সকালে পাত্রপক্ষ ফোন করে বলেছে, তাদের সকলেরই মত হয়েছে।

শিশির স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তুমি তো তোমার অমত জহ্নুকে জানিয়ে দিয়েছ।

হ্যাঁ। কিন্তু কারণটা বলিনি।

কেন বলোনি বাঁধন? তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আর আমার বেঁচে থাকার তো অর্থই থাকবে না।

কারণটা বলতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

জানি। আমার বয়স বেশি, আমি বিবাহিত, আমার দুটো সন্তান আছে, আমি স্কুলমাস্টার, এসব তো আর বলা যায়ও না।

তা নয় শিশিরদা। আমি যে চোখে আপনাকে দেখি, সেই চোখ তো সবার নেই।

আর ক'টা দিনই বা বলো! দেবীর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়ে গেছে। সেটা তো ঠেকানো যাবে না।

শিশিরদা, বউদি তিন-চার দিন আগে সন্ধেবেলা কেমন এক

চোখে যেন তাকিয়ে ছিল। সেই চোখ দেখে আমি কিন্তু একটু ভয় পেয়েছিলাম। হঠাৎ আমাকে বলল, কাছে এসে একটু বোসো তো বাঁধন।

কিছু টের পেয়েছে নাকি?

আন্দাজ করছে। আমাকে বলল, তুমি কি রোজ আমাকেই দেখতে আসো? আমি বললাম, আপনার এত অসুখ! আসব না? বউদি একটু কেমন যেন হাসল। বলল, আমার ওপর তোমার কবে থেকে এত টান হল বলো তো! কথাটার মধ্যে একটু কেমন যেন ঠেস ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, সারাদিন আপনি তো একা থাকেন, তাই ভাবি একটু কথা-টথা বললে হয়তো আপনার ভাল লাগবে। তখন বউদি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, এখন আর আমার কাউকেই ভাল লাগে না।

শিশির একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ভয় পেয়ো না বাঁধন। দু'-চারটে বাঁকা কথা সহ্য করে নাও। এখন দেবীর সব ব্যবহারই ক্ষমা করা যায়। যায় না?

আমি ভাবছি, কয়েকটা দিন একটু সরে থাকি না কেন?

মরে যাব বাঁধন, একদম মরে যাব।

বাঁধন চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিশির। জ্বালা-যন্ত্রণা নয়, চোখে জলও এল না, কিন্তু এক অসহনীয় শূন্যতায় ভরে গেল বুক। মাথা আগল-পাগল। বাঁধন ছাড়া এই দুনিয়াটাই তো মিথ্যে, বুদ্বুদের মতো। সে কিছুতেই এই বিরহ সহ্য করতে পারবে না। শরীর ঝিমঝিম করছে তার। মাথা টলছে। সে কালই বেদব্যাসবাবুর কাছে

যাবে, অকপটে বলবে সব কথা। দরকার হলে পায়ে ধরে বলবে, দয়া করে আমাদের মেনে নিন।

বিশুষ্ক, আনমনা, বশহীন শিশির যান্ত্রিক ভাবে কোচিং ক্লাস নিয়ে গেল। একটু একা হওয়া দরকার। এইসব দায়বদ্ধতা থেকে কিছুক্ষণ ছুটি নিয়ে ভয় আর আশঙ্কায় ভরা মনটাকে সামলানো দরকার। ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখা দরকার, ঠিক কোন পথে এগোলে বাঁধনকে বেঁধে রাখা যাবে। কিন্তু মাথা স্থির হচ্ছে না যে তার। ঝিঁঝি ডাকার শব্দ হচ্ছে, রাগ হচ্ছে, তীব্র হতাশায় ভেঙে যেতে চাইছে বুক। বাঁধন কী করে অন্যের হতে পারে! কেন হবে?

বাঁধনের সঙ্গে আজ তোমার কী কথা হল?

শায়িত, রোগা, সাদাটে দেবীর শীতল এই প্রশ্নটি শুনে তটস্থ হয়ে শিশির বলল, বাঁধন! বাঁধন এসেছিল নাকি? আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি!

নয়ন তোমাদের দু'জনকে মাঠের ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছে। কেন মিথ্যে কথা বলছ? নয়ন, তুই দেখিসনি?

পাশের চৌকিতে দশ বছরের নয়ন পড়ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ তো। বাবা আর বাঁধনমাসি আজ সন্ধেবেলা কথা বলছিল।

হঠাৎ বাঘের মতো হিংস্র গলায় শিশির গর্জন করে বলল, সন্দেহ করছ নাকি? কথা বলে থাকলে বেশ করেছি।

সেটা পুরুষ মানুষের মতো বলতে পারলে না? ন্যাকামি

করে মিথ্যে বানানোর কী দরকার? তোমার কোচিং-এর ছেলেমেয়েরাও দেখেছে হয়তো।

শিশির জানে, সে জবাব দিলেই তুমুল হবে। সে মিথ্যে কথা বলছে, সে রেগে যাচ্ছে, যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে এবং সে হাঁফাচ্ছে। সে শুধু পাগলের মতো দাঁতে দাঁত পিষে প্রচণ্ড মাথা নাড়া দিয়ে বলল, তুমিই আমার জীবনটাকে শেষ করেছ!

একটু অবাক হয়ে দেবী বলল, নাকি উলটোটা! তোমাকে তো আমি ভাল করে চিনতামও না! ধরে বেঁধে তুমিই তো আমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছিলে? সব ভুলে গেছ? এখন সেসব না ভুললেই বা তোমার চলবে কী করে?

চুপ করো, প্লিজ, চুপ করো!

আমি জানি তোমার তর সইছে না। পারলে তুমি হয়তো আমাকে বিষ দেবে। তাই দাও। পথের কাঁটা সরে যাক। কিন্তু তার আগে বাঁধনের মাকে আমি ফোন করে সব জানিয়ে যাব।

শিশির ঘরে থাকতে পারল না। তার নিজের ভিতরের আগুন হলকা হয়ে বেরিয়ে আসছে সর্বাঙ্গে। ছাদে উঠে ঠান্ডা বাতাসে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকল সে। তারপর ফোন করল।

বাঁধন! একটু ধৈর্য ধরো। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো।

আপনাকে ভীষণ অ্যাজিটেটেড লাগছে। কী হল হঠাৎ?

দেবী কিছু সন্দেহ করছে। হয়তো মাসিমাকে ফোন করবে।

সে কী! তাহলে তো বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে!

যা-ই হোক, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না। প্লিজ!

ওরকম করছেন কেন? আমি ঠিক আছি। কিন্তু মা জানলে খুব অশান্তি হবে।

একদিন তো ওঁদের জানাতেই হবে।

তার জন্য সময় আছে। এখনই জেনে গেলে মা-বাবা ভীষণ আপসেট হয়ে পড়বে। বাবার প্রেশার ভীষণ বেশি।

চিন্তা কোরো না। আমরা কোনও অন্যায় করছি না। ভালবাসা কোনও অবস্থাতেই অন্যায় নয়।

আমি ছাড়ছি। মা ডাকছে। পরে কথা হবে।

মোবাইল ফোনটা মুঠোয় নিয়ে অন্ধকারে চুপ করে বসে রইল শিশির। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ, অন্ধকার, মশা এবং জোনাকি। কোনও অর্থবহতা নেই কোনও কিছুর। ইতস্তত মাঠঘাট গাছপালা অনাত্মীয় সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে আছে।

অনেক রাতে সে একটা নম্বর ডায়াল করল। দু'বার শব্দ হতেই একটা ভরাট গলা বলল, হাই।

নমস্কার। আমি দুর্গাপুর থেকে কথা বলছি। আমার নাম শিশির রায়।

দুর্গাপুর থেকে! হ্যাঁ, বলুন।

আমি একজন স্কুল টিচার।

ও।

বাধ্য না হলে আপনাকে আমি ফোন করতাম না। একটা ভীষণ সমস্যায় পড়েছি বলে খুব সংকোচের সঙ্গে ফোনটা করতে হল। ক্ষমা করবেন।

ভারী মিষ্টি গলায় জহ্নু বলল, নিঃসংকোচে বলুন।

আমি বাঁধনের কথা বলতে চাইছি। আমি আর বাঁধন পরস্পরকে ভালবাসি। কিন্তু আমি স্কুল টিচার বলে ওর বাবা-মা এই বিয়েতে রাজি নয়।

তাতে অসুবিধে কী? আপনারা দু'জনেই তো অ্যাডাল্ট! আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন!

আপনি যদি বিয়েতে রাজি না হন তাহলেই একমাত্র উপায় হতে পারে।

এরকম একটা কথা বাঁধনও বলেছিল। কিন্তু আমি এখনও আপনাদের প্রবলেমটা বুঝতে পারছি না। আপনারা দু'জনেই বেদব্যাসবাবুর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলুন না।

তাতে প্রচণ্ড রি-অ্যাকশন হবে।

যদি ফেস করতে ভয় পান তাহলে রেজিস্ট্রি করে নিন। সেক্ষেত্রে কারও কিছু করার থাকবে না। আমার অরাজি হওয়ার ওপর তো বাঁধনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে না। আমি বিয়ে নাকচ করলেও পরে অন্য পার্টি আসবে। বার বার জনে জনে ভিক্ষে চাইবেন কেন? রেজিস্ট্রি করে ওর বাবাকে জানিয়ে দিন।

সেটা সম্ভব নয়।

কেন নয়? কোনও বাধা আছে কি?

আছে জহ্নুবাবু।

বাধাটা কীরকম? বাই চান্স, আর ইউ এ ম্যারেড ম্যান?

একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিশির বলল, হ্যাঁ।

মাই গড! সেক্ষেত্রে আপনাকে ডিভোর্স করতে হয়। আর কাজটা সহজ নয়।

আমার স্ত্রীর টার্মিনাল ডিজিজ। কেমোথেরাপি চলছে।

স্যাড। কী আর করবেন, অপেক্ষা করা ছাড়া!

বাঁধনের মা-বাবা ওর বিয়ে দেওয়ার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বুঝলাম। আপনাদের সমস্যাটা জটিল। এক্ষেত্রে আমি আপনাকে কী পরামর্শ দেব ভেবে পাচ্ছি না।

বাঁধন হয়তো আপনাকে আমার কথা বলেনি। আমি যে আপনাকে ফোন করেছি এটা প্লিজ ওকে বলবেন না।

না, বাঁধন আমাকে আপনার কথা কিছুই বলেনি। আমার মোবাইল নম্বর কি বাঁধন আপনাকে দিয়েছে?

না। আমি ওর মোবাইল থেকে সেভ করা নম্বরটা টুকে নিয়েছি।

আমার সঙ্গে কথা বলে আপনার হয়তো তেমন লাভ হল না। আই ওয়াজ অফ নো হেলপ।

আমি আসলে একটু সময় চাইছিলাম।

সেই ব্যাপারেই বা আমি কী করতে পারি?

আপনিই পারেন।

কীভাবে?

হয়তো আপনার কাছে একটু বেশিই দাবি করছি আমি। কিন্তু আমাদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে যদি দয়া করেন।

সেটা কী?

আপনি এখুনি অমত জানাবেন না।

ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে চাইছেন?

হ্যাঁ। যত দিন পারা যায়।

সেটা সম্ভব নয়। আমার মা বাবা এবং বোন এরা সবাই আমার গার্জিয়ান। এদের চাপেই আমি বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। তারা কিছুতেই আমাকে সময় দেবে না। তবে অফিসের টালবাহানা দেখিয়ে হয়তো এক বা দুই মাস সময় নেওয়া যায়। তার বেশি নয়। আমি যত দূর জানি আমার বাড়ি থেকে ওদের গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হয়ে গেছে।

তাহলে কী হবে?

কিছুই হবে না। ভয় পাবেন না। পাত্র তো আমি, আমার হাতেই তুরুপের তাস। আজ রাতে যখন বাঁধনের সঙ্গে কথা হবে তখন জানিয়ে দেব।

বাঁধনের সঙ্গে আপনার রোজ কথা হয়?

হয়। প্রেমালাপ নয় মশাই। জাস্ট কথা। সাংবাদিকতা নিয়ে, পলিটিক্স নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে। আমরা বেশ বন্ধু হয়ে গেছি।

অনেক ধন্যবাদ। যেটুকু সময় দিলেন তাই যথেষ্ট।

একটা কথা শিশিরবাবু। আপনার স্ত্রীর টারমিনাল ডিজিজ। ওঁকে এই সময়টায় যথাসাধ্য কমফর্ট দিন। আপনার দিক থেকে কোনও ত্রুটি রাখবেন না। হয়তো এখন আর আপনার ভালবাসাটা নেই, কিন্তু গিভ হার এভরিথিং ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড।

আচ্ছা, আমি কি জহ্নু চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ।

আমি কাঁকন।

কাঁকন! কে বলুন তো, ঠিক—

কাঁকন ঘোযাল। আচ্ছা ভুলো লোক তো আপনি!

ওহোঃ এবার বুঝতে পেরেছি।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, আমার দিদিকে কি আপনার পছন্দ হয়নি?

কে বলল হয়নি?

তাহলে উলটোপালটা কথা বলছেন কেন?

কী বলেছি বলো তো!

বলেছেন, দিদির মতো সুন্দরীকে নাকি আপনাদের পরিবারে মানায় না।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়।

কথাটা একটা অজুহাত। আপনি দিদিকে বিয়ে করতে চাইছেন না।

এ কথাটা সত্যি নয়।

তাহলে মত দিচ্ছেন না কেন? আপনার বাড়ির সবাই তো রাজি!

হ্যাঁ, সকলেরই বাঁধনকে খুব পছন্দ।

তাহলে আপনার অপছন্দ হচ্ছে কেন?

একটুও অপছন্দ নয় তো!

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে বলুন তো!

তার আগে বলো, তোমার সঙ্গে তোমার দিদির কি কথাবার্তা নেই? আড়ি করে বসে আছ নাকি দু'জনে?

ও মা! কী বলে রে! দিদির সঙ্গে রোজ রাতে তো ফোনে আমার আড্ডা হয়।

তোমার দিদি কী বলছে?

বলছে আপনার নাকি একটু অসুবিধে আছে। অসুবিধেটা কী? কোনও লাভ অ্যাফেয়ার?

না, কাঁকন।

তাহলে বাধাটা কিসের? মুশকিল কী জানেন, আমার কোম্পানি আমাকে বেঙ্গালুরু পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি চাইছি, বেঙ্গালুরু যাওয়ার আগেই বিয়েটা হয়ে যাক।

বেঙ্গালুরু তো ভাল জায়গা।

আমি কি বেঙ্গালুরু কেমন জায়গা তা আপনার কাছে জানতে চেয়েছি? কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছেন কেন?

আমি শুনেছি, তুমি এরপর আমেরিকায় যাবে।

তার দেরি আছে। এবার সত্যি কথাটা বলবেন?

সত্যি কথাটা তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না।

কেন হবে না?

এই বিয়েতে বাঁধনই রাজি নয়।

সে কী? দিদি তো আমার কাছে আপনার অনেক গল্প করে। রোজ আপনাদের ফোনে অনেক কথাও হয়। তাহলে কী হচ্ছে এসব?

সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু বাঁধনের কিছু প্রবলেম আছে। তোমাকে কেন বলেনি সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছি।

বিশ্বাস করুন আমি কিচ্ছু জানি না। কিন্তু এটা জানি যে, দিদির আপনাকে খুব পছন্দ। বলেছে, আপনি খুব ফ্রেন্ডলি ম্যান আর ঠান্ডা মাথার মানুষ।

আমি যে একটু বোকা, একটু ট্যারা, দাঁত উঁচু আর কালো সেটা বলেনি বুঝি?

বলেছে। আর এটাও বলেছে যে আপনি ভীষণ বাজে লোক। কেবল মিথ্যে কথা বলেন। বিয়ের কী হবে সেটা দয়া করে বলবেন?

আমার একটা প্রস্তাব আছে।

কী প্রস্তাব?

তোমার দিদি যখন রাজি নয়, তখন তুমিই বিয়ে করে ফ্যালো আমাকে।

কী অসভ্য! ভীষণ বাজে লোক আপনি। কালো, ট্যারা আর দাঁত উঁচুকে বিয়ে করতে বয়েই গেছে আমার। দিদির প্রবলেমটা কী, তা আপনাকে বলেনি?

দিদি না বললেও আর-একজন বলেছে।

কে?

সেটা বলা যাবে না। বারণ আছে।

কী বলেছে বলুন তো?

শি ইজ ইন লাভ।

বাজে কথা। শুনুন মশাই। কেউ প্রেমে পড়লে সহজেই বোঝা যায়। দিদিকে আমি ভীষণ চিনি। ও কিছু লুকোতেও পারে না, সব ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলে দেয়। প্রেমে পড়লে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম।

তোমার অবজার্ভেশন তেমন শার্প নয়।

ইস, তাই বুঝি? কী করে বুঝলেন?

তোমার কথা শুনে। আমি বাঁধনকে প্রথম দিন দেখেই বুঝে যাই যে, তার কোনও একটা সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট আছে।

আপনি কবে কলকাতায় আসবেন বলুন তো?

সামনের শনি বা রবিবার। কেন বলো তো!

আপনার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আমার ঝগড়া করা দরকার।

আমি যে ঝগড়া মোটেই করতে পারি না।

আমি দুর্বল প্রতিপক্ষই পছন্দ করি। আপনি ঝগড়া করবেন কেন? আমি ক্যাট ক্যাট করে কথা শোনাব, আর আপনি চুপটি করে বসে শুনবেন।

সেটা কি জমবে? একতরফা হয়ে যাবে না?

হলে হবে। ঝগড়ুটে পুরুষমানুষ আমি একদম পছন্দ করি না। আপনি হাসছেন কেন?

তুমি টেলিফোনেই আমাকে কী করে চিনে ফেললে ভেবে অবাক হচ্ছি। আমি ঝগড়া করতে পারি না বলে বাড়ির সবাই আমাকে নানা ভাবে ডমিনেট করে।

প্লিজ, কবে আসছেন বলুন না!

তুমি যা বললে, তাতে তো কলকাতায় ফিরতে এখন ভয় করছে।

আপনি কলকাতায় না এলে আমাকেই দিল্লি যেতে হয়।

ওরে বাবা!

শুনুন, লোকটার নাম আমার জানা দরকার। দিদি যদি

কারও কোনও ট্র্যাপে পড়ে থাকে তাহলে ওকে স্যালভেজ করতে হবে। দিদিটা ভীষণ বোকা আর ভালমানুষ বলে সমস্যা হয়।

জহ্নু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা বোধহয় তোমার জানা দরকার। লোকটি বিবাহিত।

মাই গড! দিদির চেনাজানা ম্যারেড প্রেমিক কে থাকতে পারে আমার মাথায় আসছে না।

লোকটির স্ত্রীর ক্যানসার।

কী বলছেন?

এরকম কাউকে চেনো?

শিশিরদা নয় তো?

আমি অনেকটা বলে ফেলেছি। এখন ডিডাকশন তোমার হাতে।

এ তো অসম্ভব! শিশিরদার বয়স চল্লিশের ওপরে। দুটো বাচ্চা আছে।

প্রেম কি কোনও বাধা মানে?

প্লিজ! ওসব ন্যাকা কথা বলবেন না তো! আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।

আর ইউ ইন্টেলিজেন্ট?

কেন, সন্দেহ আছে বুঝি?

বলছি, মাথা গরম করে দুম করে কিছু করে বোসো না। লোকটা এখন ইনফ্যাচুয়েটেড। তার কথা শুনে মনে হয়েছে সে একটা সাংঘাতিক টেনস্ড্ অবস্থায় আছে।

কথা! সে কি আপনার সঙ্গে কথাও বলেছে নাকি?

হ্যাঁ। পরশু রাতে।

কেন ফোন করেছিল?

যাতে আমি এই বিয়েতে রাজি না হই।

শিশিরদার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি।

লোকটা কেমন?

আমরা এত কাল তো শিশিরদাকে ভীষণ ভাল বলেই জানতাম। এ ভেরি হ্যান্ডসাম ম্যান। অনেক গুণ আছে। সবাই এক ডাকে চেনে। কিন্তু দিদির সঙ্গে তার প্রেম হয় কী করে?

সব সম্পর্ক কি অঙ্কের নিয়মে হয়?

শিশিরদা দিদিকে আর আমাকে অঙ্ক আর ইংরিজি পড়াত। ভীষণ ভাল টিচার। ওঁর জন্যই আমি দুটো সাবজেক্টে নব্বই পারসেন্টের ওপর নম্বর পেয়েছিলাম। কিন্তু—

আমি তোমাকে অনেকটা বলে ফেললাম। বলাটা হয়তো উচিত হল না।

কাঁকন ঝামরে উঠে বলল, কেন উচিত হবে না? একটা বুড়ো, বেয়াদব, বিয়েওলা লোক আমার দিদিকে নষ্ট করবে, আর আপনি চুপ করে থাকবেন বুঝি? মাগো! আমি ভাবতেও পারি না দিদি একটা মধ্যবয়সি দোজবরেকে বিয়ে করে ডুরে শাড়ি পরে আগের পক্ষের গ্যাদড়া বাচ্চাদের সামলাচ্ছে। ওঃ গড! ওর রুচি এত নীচে নামল কী করে? আপনি হাসছেন কেন?

মাঝখানে হঠাৎ একটা ডুরে শাড়ি এনে ফেললে তো, তাই।

আপনার শিভালরি বলে কিছু নেই?

সেটা কী জিনিস, গায়ে দেয় না মাথায় মাখে?

আপনি ভীষণ বাজে লোক।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কী করার আছে বলো!

আছে, আছে। ইচ্ছে করলে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। আমার বোকা দিদিটাকে এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা থেকে বাঁচাতে পারেন।

কীভাবে?

আপনি গিয়ে জোর করে ওকে তুলে আনতে পারেন। এমব্রেস হার, কিস হার, স্ন্যাচ হার অ্যাওয়ে!

বাপরে! তুমি তো দাঙ্গাবাজ মেয়ে!

একটু হতাশ আর কাঁদো কাঁদো গলায় কাঁকন বলল, আপনার কাছে বড্ড বেশি দাবি করে ফেললাম, না?

জহ্নু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমার জায়গায় হলে আমিও হয়তো তোমার মতোই রি-অ্যাক্ট করতাম। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বাঁধন আমার প্রেমে পড়েনি, পড়েছে আর-একজনের। তুলে আনলে যে অপহরণের কেসে পড়ে যাব।

কিন্তু কালও তো মা ফোনে আমাকে খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলেছে, জানিস, বাঁধন রোজ জহ্নুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলে। গানও শোনায়। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব ভালবাসা। ভালবাসাই যদি না হবে তাহলে আপনাদের রোজ এত কথা হয় কেন? প্রেম না থাকলে ফোনে গান শোনানো যায় বুঝি?

জহ্নু একটু হাসল। বলল, গজলটা বড্ড ভাল গায় মেয়েটা।

ভাল গায় বলেই বুঝি যাকে-তাকে ফোনে গান গেয়ে

শোনানো যায়? ভালবাসা হলেই ওসব হয়। ভালবাসা না থাকলে অত কথাও তৈরি হয় না।

জহ্নু হেসে ফেলল, এত জানলে কী করে! প্রেমে পড়েছ বুঝি!

দূর। আমি রসকষহীন মানুষ। আমার প্রেম শুধু কম্পিউটারের সঙ্গে। আর, আমি দিদির মতো গানও জানি না। কিন্তু কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, কী নিয়ে আপনাদের প্রেমহীন কথাবার্তা হয় তাহলে? বাজারদর নিয়ে তো নিশ্চয়ই নয়!

বলব! শুনলে হাসবে না তো?

আমার হাসির মুডই নেই! কেবল রাগ হচ্ছে। বলুন না প্লিজ। আপনারা কি এখনও আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন? না তুমি-তুমি?

তুমি-তুমি।

দ্যাটস এ গুড সাইন।

আজকাল সবাইকে সবাই তুমি-তুমিই তো বলে।

আমার দিদিটা যে বড্ড সেকেলে। একদম প্যাথেটিক। এবার বলুন কী নিয়ে দু'জনের বকবকমটা হয়?

নাথিং সেন্টিমেন্টাল। বাঁধন ফোন করেই হয়তো বলে, অ্যাই, তুমি আজ রাত দশটায় ফোন করোনি কেন? আমি হয়তো বললাম, সরি, অফিসের কাজে আটকে গিয়েছিলাম। একটু বাদেই ফোন করতাম। এইভাবেই শুরু হয় হয়তো।

বাঃ! শুরুটা তো শুনতে দারুণ লাগছে!

ও আমাকে রোজই জিজ্ঞেস করে আজ আমি কী খেয়েছি

আর কোথায় কোথায় গেছি আর কোনও ভিআইপি-র সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না। আমি ওকে বলি, জানো তো, হরদোয়ারে আমার এক সাধুর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। সে আমাকে বলেছে, সন্ন্যাস নিলে সে আমাকে হিমালয়ের অনেক অজানা জায়গায় নিয়ে যাবে। এ কথায় ও হয়তো বেশ রেগে গিয়ে বলল, খবরদার, ওই সাধুর সঙ্গে তুমি আর মিশবে না, হরিদ্বারেও আর যেয়ো না।

তবু বলবেন আপনাদের মধ্যে প্রেম নেই! দিজ আর দা ক্লাসিক সাইনস অফ লাভ!

আমি ওকে একটা ফরাসি রান্নার রেসিপি বলেছিলাম। ও বলেছে, সেটা রান্না করে আমাকে খাওয়াবে।

হাউ সুইট অফ হার!

স্বীকার করতেই হয় যে, শি ইজ সুইট।

অ্যান্ড শি ইজ ইন লাভ উইথ ইউ!

না। আসলে বাঁধন একজন দয়ালু মহিলা। শি ইজ সুইট টু এভরিবডি। বললে তুমি হয়তো রেগে যাবে। কিন্তু যদি ঠান্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখো তাহলে দেখবে এই যে দুই সন্তানের বাবা বয়স্ক, বিবাহিত এক পুরুষের প্রতি ওর ভালবাসা এটাও কিন্তু ভীষণ সুইট।

আপনি কি জানেন যে আপনি ভীষণ বিচ্ছিরি একটা লোক!

এটা করতে কিন্তু ভীষণ সাহসও লাগে। বাঁধনের সাহস দেখে আমি খুব ইম্প্রেসড।

সাহস নয়, বোকামি। আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল,

যেমন চালাক, তেমনি পাজি। রোজ ইনিয়েবিনিয়ে নিজের দুঃখের কাঁদুনি গাইত। তার ছেলের টাইফয়েডের কথা শুনে দিদি গোপনে কানের দুল খুলে দিয়ে দিয়েছিল। মাকে বলেছিল দুল হারিয়ে গেছে। পরে জানা গিয়েছিল, সেই ছেলের মোটেই টাইফয়েড হয়নি।

বুঝলাম।

কী বুঝলেন?

বুঝলাম, বাঁধন আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। ও অফবিট। আমার এরকম মেয়ে খুব পছন্দ।

সত্যিই পছন্দ?

হ্যাঁ। শি ইজ ডিফারেন্ট।

পছন্দই যদি, তাহলে ওকে এই সিচুয়েশনটা থেকে রেসকিউ করছেন না কেন? একটা অবোধ হরিণশিশুকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচানোটা কি কর্তব্য নয়?

না। সেটা বাঘের প্রতি ইনজাস্টিস হবে। হরিণশিশু বাঘের ন্যাচারাল ফুড। তাকে বাঁচালে বাঘকে অনশনে মরতে হয়। সেটা কি উচিত হবে?

উঃ! আপনাকে কী ইচ্ছে করছে জানেন? আচ্ছা, আগে বিয়েটা তো হোক, তারপর দেখাচ্ছি মজা!

বিয়ে তো হতেই পারে। তবে বাঁধনের স্লটটা তো খালি নেই। তোমার স্লট যদি খালি থাকে—

ফের ইয়ারকি? আপনার সঙ্গে আমার আরও ঝগড়া আছে। এখন থেকে রোজ ঝগড়া করব। আজ আমার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। বাই।

বাই।

রামসেতু নিয়ে আগামীকাল এক ডাকসাইটে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সঙ্গে একটা একান্ত সাক্ষাৎকার আছে। ফলে জহ্নুর হাতে কয়েক দিন ধরেই রয়েছে হেমেনবাবুর একখানা রামায়ণ, আর বিস্তর বিতর্কিত রিপোর্ট। প্রথম থেকে শেষ অবধি রামায়ণখানা তার কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে এবং সে খানিকটা নেশাগ্রস্ত বোধ করছে। মহাগ্রন্থ শুধু ভক্তিরসাশ্রিত নয়, তার মধ্যে নিহিত থাকে অনেক মানবিক দোষ দুর্বলতাও। রামায়ণকার শ্রীরামচন্দ্রকে দেবতা জ্ঞান করেও তাঁর মানবিক অসহায়তাও বড় কম তুলে ধরেননি। আর গোটা কাহিনিজালের মধ্যে শ্বাসরোধকারী এক বিস্তার আছে, যা মাথাকে সম্পূর্ণ দখলে নিয়ে নেয়। ভাবায়, উত্তেজিত করে, বাস্তব থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। আজকাল প্রায় সবসময়েই সে রামায়ণে বিচরণ করে।

রাত দশটার পরে সে খুব মন দিয়ে রামায়ণ খুলে একটা চিরকুটে কিছু নোট নিচ্ছিল। মন্ত্রীজি গতকালও এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, প্রাচীন রামসেতুর অস্তিত্ব নেই, তা এক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু নয়। বিরুদ্ধ দল তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। সুতরাং প্রশ্নমালা সাজাতে হবে চাতুর্যের সঙ্গে।

সে কি নিজে রামসেতুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী? জহ্নু এ প্রশ্নের সঠিক জবাব নিজের অন্তরে খুঁজে পায় না। একটা দোলাচল বা ধাঁধা আছেই।

রাত দশটার পরই সাধারণত ফোনটা আসে। আজও এল।

ভারী মিষ্টি নরম গলা, কী করছ এখন?

কাজ।

তোমার সব সময়ে এত কী কাজ?

কাল এক জাঁদরেল মন্ত্রীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তারই প্রিপারেশন।

খুব জরুরি নাকি? কথা বলতে পারবে না এখন?

আরে না। তোমার জন্য সব সময়েই আমার সময় আছে।

খেয়েছ?

এত তাড়াতাড়ি খাবার কবে খাই? দেরি আছে।

আমার মন ভাল নেই।

তোমার আবার কবে মন ভাল থাকে! রোজই তো শুনি, মন ভাল নেই।

শুনে বিরক্ত হও না তো!

না। বরং অন্য রকম শুনলেই অবাক হতাম।

রোজ একজন বিষণ্ণ বালিকার বিলাপ শুনতে বুঝি ভাল লাগে?

অন্যের মুখে শুনলে লাগত না, তোমার মুখে যা-ই শুনি তা-ই আমার ভাল লাগে।

মিথ্যুক কোথাকার!

সত্যি বলছি।

আজ আমার মন সত্যিই খারাপ।

কেন খারাপ? আজ নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

হ্যাঁ তো! আজ আমি খুব ভয় পেয়েছি যে!

ভয় পেয়েছ? কী হয়েছে বাঁধন?

আজ আমি একটা বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই বাড়িতে একজন অসুস্থ মহিলা প্রায় সব সময়ে শুয়ে থাকেন। তাঁর খুব খারাপ অসুখ। বাঁচবেন না। আমি তাঁর সামনে যাই না। গেলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়। একজন মারা যাবে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কি ভাল লাগে বলো? কিন্তু একটা আধবোজা জানালা দিয়ে তাঁকে একটুখানি দেখা যায়। আমি মাঝে মাঝে সেই ফাঁক দিয়ে তাঁকে একটুখানি দেখে আসি। কেন দেখে আসি জানো? উনি আমাকে আগে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু এখন একটুও পছন্দ করেন না। আজ যখন সেই ফাঁকটায় চোখ রেখেছি, হঠাৎ দেখি তিনি সোজা আমার দিকে চেয়ে আছেন। কী ভয়ংকর চোখ! আমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে কেমন যেন জড়ভরত হয়ে গেলাম। নড়তেই পারছি না। আর তিনি ভীষণ জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, কে? কে ওখানে? কে ওখানে? কে ওখানে? আমার হার্ট ফেল হয়ে যেত জানো! দৌড়ে পালাতে গিয়ে একটা বেড়ালকে মাড়িয়ে দিলাম। সেটা ফ্যাঁস করে উঠল। আর একটু হলেই কামড়ে দিত। কীভাবে যে পালিয়ে এসেছি তা নিজেই জানি না। এখনও আমার বুক ধক ধক করছে। যতবার ওই দুটো চোখ মনে পড়ছে ততবার বুক হিম হয়ে যাচ্ছে। আজ রাতে আমার ঘুমই হবে না।

বেড়ালটা তোমাকে আঁচড়ে-টাঁচড়ে দেয়নি তো?

বেড়ালটা! না বোধহয়। তখন কি মাথার ঠিক ছিল আমার! তবে মনে হয় আঁচড়ায়নি।

ভাল করে পা-টা দেখো। আমি ওটা নিয়েই বেশি চিন্তিত।

কেন বলো তো!

ভাল করে দেখো, পায়ে কোথাও জ্বালাটালা করছে কি না। কুকুর--বেড়ালের নখেও নানারকম বিপদ থাকে।

না, আঁচড়ায়নি। শাড়ি পরা ছিল তো, আঁচড়ালেও শাড়ির ওপর দিয়ে গেছে।

ভয় তো তোমার রোগ। কথায় কথায় এত ভয় পেলে চলবে কী করে? আর ওই ভদ্রমহিলাকে চুপিচুপি দেখতে যেয়ো না যেন! ভদ্রমহিলার কী হয়েছে বলো তো! ক্যানসার নাকি?

হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে?

জানি না তো! আন্দাজ করলাম।

কোলোনে।

কিছুদিন ওই বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করলেই তো হয়।

আমার তো ওইটেই নিয়তি। বড্ড মায়া হয়, জানো! কী সুন্দর দেখতে ছিলেন উনি! একদম ডল পুতুলের মতো। এখন দেখলে সেই মানুষটার কোনও চিহ্নই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার কী ভয় হয় জানো! মনে হয়, আমারও তো একদিন এইরকম হয়ে যেতে পারে!

ভিতুরা মরার আগে অনেকবার মরে, জানো তো?

জানি, খুব জানি। ভিতু হলে কী করব বলো!

সেটাই তো সমস্যা। ভয়ের কোনও ওষুধ নেই।

আর যেখানেই ভয়, যেখানে গেলেই মন খারাপ, সেইখানেই কেন যে আমাকে যেতে হয় কে জানে। ইচ্ছে করে যাই না কিন্তু, জানো? কী যেন আমাকে টেনে নিয়ে যায়। হিপনোটিজমের মতো।

অবসেশন থাকলে ওরকম হতেই পারে।

আচ্ছা, আমাকে কি তোমার মিথ্যেবাদী মনে হয়?

না তো! হঠাৎ এ কথা কেন?

মিথ্যেবাদী না হলেও আমার ভিতরে তো মিথ্যাচার আছেই।

সে আমাদের সকলের মধ্যেই আছে।

কিন্তু আমি যে তোমার কাছে অনেক কথা গোপন করি, সেটা তো মিথ্যাচারই হচ্ছে, তাই না! সেটা কি আমার করা উচিত, বলো?

কথা গোপন করাটা মিথ্যাচার হবে কেন? অনেক কথা তো গোপন রাখতেই হয়।

কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে করে, কারও কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আমার সব গোপন কথা মন খুলে গলগল করে বলে দিই। সেটা হলে আমার সব সময় এত মন খারাপ করে থাকতে হত না। কিন্তু কার কাছে বলি বলো তো?

তেমন লোক কোথায় পাবে বাঁধন? মানুষকে কত কথাই তো বুকে পুষে রাখতে হয়।

একটা কথা বলব? হাসবে না?

না, বলো।

আমার মাঝে মাঝে তোমার কাছেই সব বলে দিতে ইচ্ছে হয়।

আমাকে তো তুমি ভাল করে চেনোই না!

সেই তো! মোটে একদিন দেখা, তাও চোরাচোখে। তবু কেন এরকম অদ্ভুত ইচ্ছে হয় কে জানে! তোমার নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে?

না, পাচ্ছে না। তার কারণ, তোমার গোপন কথাটা আমি জানি যে!

ওমা! জানো? সত্যিই জানো? কী বলো তো?

শিশির রায়ের কথা তো?

মাগো!

লজ্জা পেয়ো না বাঁধন। আমি জানলে ক্ষতি কী?

কী করে জানলে? আমি তো কাউকে কখনও বলিনি!

তুমি কিছুমাত্র অন্যায় তো করোনি। একজন বিপন্ন লোকের পাশে থাকার চেষ্টা করছ। আমি মনে করি তোমার সিদ্ধান্তের মধ্যে মহত্ত্ব আছে। তুমি শ্রদ্ধার পাত্রী। আমার যখন বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর বয়স হবে তখন যদি পঁচিশ বছরের একটি মেয়ের মনোযোগ পাই তাহলে হয়তো জীবন অন্যরকম হবে।

না, তুমি ওরকম হবে না! কিছুতেই না!

কেন বলো তো?

তোমাকে শিশির রায় হতে হবে না। তুমি তোমার মতো থাকবে। ঠান্ডা, ধীর, স্থির, আর ভীষণ ভাল।

শিশিরবাবু কি ভাল নন?

তাই কি বলেছি?

কথাটার মানে তো তাই দাঁড়ায়।

ভাল হয়তো নানারকম হয়। ধরো আমার বাবা কিংবা মা। তারা হয়তো ভাল, হয়তো মন্দ। কিন্তু আমার কাছে আমার বাবার মতো ভাল, আমার মায়ের মতো ভাল আর কে আছে বলো! বাবার শরীর সেদিন একটু খারাপ হল, তো আমার

দুনিয়াটাই যেন টালমাটাল হয়ে গেল। কতগুলো মানুষ আছে যাদের ভাল বা মন্দ বিচার করা খুব শক্ত।

শিশিরবাবু কি সেরকম?

অনেকটা। যখন উনি প্রথম আমাকে পড়াতে এলেন তখন আমি তো একরত্তি একটা মেয়ে। হাঁ করে, মুগ্ধ হয়ে ওঁর কাছে পড়া শুনতাম। ভীষণ হ্যান্ডসামও ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে এমন একটা হিপনোটিক স্পেল-এ পড়ে গেলাম যে, রোজ কখন উনি পড়াতে আসবেন তার জন্য ভারী ছটফটে অপেক্ষা ছিল আমার। তুমি অবসেশনের কথা বলছিলে। এটাও বোধহয় তাই। উনি বিবাহিত, দুটো বাচ্চার বাবা, স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন। আমার শুধু মনে হয়, আমাকে ওঁর খুব দরকার। উনিও তাই বলেন। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করো।

আমাকে তোমার ঘেন্না হচ্ছে না তো?

না বাঁধন, বরং শ্রদ্ধা হচ্ছে। তুমি একজন সাহসী মহিলা। তুমি আজ যাকে দেখে ভয় পেয়েছিলে তিনি বোধহয় শিশিরবাবুর স্ত্রী!

হ্যাঁ। কী করে বুঝলে?

সহজ ডিডাকশন। ওঁর কি যথাযোগ্য চিকিৎসা হচ্ছে?

হ্যাঁ। এই তো চারদিন আগে থার্ড কেমো হয়ে গেল।

তোমাদের দু'জনকে ওঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তাই তো?

ওভাবে কেন বলছ! শুনে বুকটা কেমন গুড়গুড় করে উঠল! প্লিজ, ও কথাটা একদম শুনতে চাই না।

ধরো যদি চিকিৎসায় উনি ভাল হয়ে গেলেন, তখন কী হবে?

ও মা! আমি তো রোজ ঠাকুরের কাছে সেটাই প্রার্থনা করি। দেবী বউদি ভাল হয়ে গেলে আমি তারকেশ্বরে পুজো দেব যে!

জহ্নু হেসে ফেলল, তুমি একটা আস্ত পাগলি।

বকছ?

না বাঁধন। তোমার কথাটা শুনে হঠাৎ মনটা ভিজে গেল। এইরকমই বোকা তুমি, ঠিক এইরকম।

তোমাকে অনেক রাত অবধি জাগিয়ে রেখেছি, না?

তাতে কী? রাত জাগায় আমার অভ্যাস আছে।

কাল ফের বকবক করব, কেমন?

কোরো। আমি তোমার ফোনের জন্য রোজ অপেক্ষা করি, জানো তো!

জানি। আমার তো কথা বলার কেউ নেই। তুমি ছাড়া।

জহ্নু হাসল। ফোন ছাড়ার পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

ঠিক সাড়ে দশটায় মন্ত্রী বৈঠকখানায় এসে বসলেন। সাদা পাঞ্জাবি সাদা পাজামা, মুখে একটু স্মিত হাসি। অবয়বে আত্মবিশ্বাস থমথম করছে।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং ইয়ং ম্যান, বি কমফর্টেবল। এনি টেপরেকর্ডার উইথ ইউ?

আই হ্যাভ ওয়ান স্যার।

সুইচ ইট অফ! প্লিজ!

কথাটার মধ্যে একটা 'প্লিজ' থাকলেও গলায় সুস্পষ্ট কর্তৃত্বের ভাব। জহ্নু তার ব্যাগের জিপার টেনে বন্ধ করে দিল। নোট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মন্ত্রীজি হিন্দির ধার ধারেন না, কথা বলেন প্রায় মার্কিন ঘেঁষা ইংরিজিতে।

নাউ ইয়ং ম্যান, ডু ইউ বিলিভ ইন রামসেতু?

জহ্নু বিনীত হেসে বলে, আই ডোন্ট নো হোয়াট টু বিলিভ স্যার।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি।

আপনি? কিন্তু স্যার, সরকারি বিবৃতিতে রামসেতুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়।

আমি জানি বৎস, মন্ত্রী হিসেবে আমাকেও ওই কথাই বলতে হবে। কিন্তু অফ দি রেকর্ড, আমি বিশ্বাস করি দ্যাট আন্ডারওয়াটার রিজ অফ বোল্ডার্স ওয়াজ বিল্ট বাই সাম ভেরি এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ডেডিকেটেড পিপল।

কিন্তু স্যার ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন, রামসেতু ইজ ন্যাচারাল রিজ, নট ম্যানমেড।

বিজ্ঞানীদের পকেটে সব সময়েই সবরকম ব্যাখ্যা থাকে। যদি তুমি একটা ভৌতিক ঘটনা বলো বা উফো দ্যাখো বা অতিলৌকিক কোনও ফেনোমেনন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা তার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে, সেটা সত্যি হোক বা না-হোক। ব্যাখ্যা দেওয়াই ওদের কাজ। একজন বৈজ্ঞানিককে যদি জিজ্ঞেস করো, মশাই, সূর্য রোজ পুবদিকেই কেন ওঠে, তারা তারও একটা জবাব দিয়ে দেবে। যদিও আসল সত্যটা তাদের জানা নেই।

তাহলে আপনি সত্যিই রামসেতুতে বিশ্বাস করেন?

করি, কিন্তু অফ দি রেকর্ড। তুমি যদি তোমার কাগজে লেখো যে, আমি রামসেতুতে বিশ্বাস করি তাহলে আই উইল প্রম্পটলি ডিনাই ইট। বুঝলে?

হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আপনি কি রামচন্দ্রের অস্তিত্বে বিশ্বাসী?

নয় কেন? রামচন্দ্র নামে যে একজন রাজা ছিলেন এটা তো ঋগ্বেদেই আছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রামচন্দ্র ফিকটিশাস চরিত্র, ওরকম কেউ ছিল না।

ছিল কি না তা এক্সপার্টরাও জানে না, আমরাও জানি না। কিন্তু রামায়ণ নামে একটি গ্রন্থ আছে, সেটা একজন রাজা রামচন্দ্রকে নিয়ে লেখা। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে রামচন্দ্রের রেফারেন্সও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং রামচন্দ্র নামে কেউ ছিলেন, এটা মানতে তো অসুবিধে নেই।

রামায়ণ তো ইতিহাস নয়।

ইতিহাস ব্যাপারটা কী জানো? এ হ্যান্ডফুল অফ ফ্যাক্টস অ্যান্ড এ লট অফ ইমাজিনেশন্স অ্যান্ড গেসেস। সেই জন্যই ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে হিস্টোরিয়ানদের মধ্যে ঝগড়ার শেষ নেই। তাজমহল কি সত্যিই এ মনুমেন্ট অফ লাভ, না কি এ সিম্বল অফ সাজাহান'স ইগো? সুতরাং ইতিহাসেও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু আপনি কি রামসেতুর ওপরে সেতুসমুদ্রম প্রোজেক্টকে সমর্থন করেন?

আউট অফ দি রেকর্ডস, সমর্থন করি না। কিন্তু সরকারি

মুখপাত্র হিসেবে, অবশ্যই করি।

জহ্নু ফের হেসে ফেলল, ক্ষমা করবেন স্যার, ধরা গেল রামসেতু সত্যিই রামচন্দ্র তৈরি করেছিলেন। তাহলে তার ওপর একটা আধুনিক ব্রিজ হলে ক্ষতি কী? রামচন্দ্রের হাতে আধুনিক প্রযুক্তি থাকলে তিনিও হয়তো তাই করতেন!

ইয়ং ম্যান, ক্ষতি এই কারণে যে, একটা ম্যানমেড ওয়ান্ডারকে চিরতরে নষ্ট করে ফেলা হবে, ধ্বংস হবে একটা মিথ। এবং ব্রিজ হয়ে গেলে জলের তলাকার প্রাচীন সেতুটির কথা আর লোকে মনে রাখবে না। মনে রেখো, ওই রামসেতু একদিন জলস্তরের ওপরে বিরাজ করত। লোকে হেঁটে সমুদ্র পেরিয়ে যেত, চলত বাণিজ্য এবং বিনিময়। কিন্তু টাইডাল ওয়েভ আর ন্যাচারাল ইরোসনে সেতুটি আজ জলে ডুবে আছে। কিন্তু আছে তো! জলের নীচে আছে বলে কি সে তার মহিমা হারিয়েছে!

তাহলে কি স্যার, আপনি বিজ্ঞানীদের মত অস্বীকার করছেন?

অবশ্যই। এখনকার বিজ্ঞানীরা কিছুতেই পুরনো আমলের বিজ্ঞানকে স্বীকার করতে চায় না। তাতে তাদের ইগো চোট খায়। আমি বিজ্ঞানীদের কী মনে করি জানো? আমি মনে করি দে আর অ্যাকচুয়ালি ম্যাজিশিয়ানস। তফাত হল, ম্যাজিশিয়ানরা ম্যাজিক দেখানোর আগে বলে নেয় যে, আসলে তারা যা দেখাতে যাচ্ছে তা কোনও মন্ত্রতন্ত্র বা জাদু নয়, নেহাতই হাতের কৌশল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সে কথাটা বলে না। তারা বলে, দে আর আফটার ট্রুথস। দে আর মেকিং

ফুলস অফ মিলিয়নস অফ আস বাই দেয়ার ট্রিকস। সত্যের সন্ধান তারা কিছুই জানে না।

এ কথাটা কি লিখতে পারি স্যার?

না। আমি নিজে একজন বিজ্ঞানী। আমার মুখ থেকে কথাটা বেরোলে দেয়ার উইল বি ডিজঅ্যাপয়েন্টমেন্টস। কিন্তু ইয়ংম্যান, তোমাকে বলি, মানুষ ততটুকুই জানতে পারে, যতটুকু তাকে জানতে দেওয়া হয়। মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তার একটা সিলিং আছে। আর আছে বলেই মানুষ কখনও ইনফিনিটিকে মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বা দর্শন দিয়ে সে যেটুকু জানে তা প্রকৃত সত্যের কোটি কোটি ভগ্নাংশেরও কোটি কোটি ভগ্নাংশ মাত্র।

তাহলে স্যার, রামসেতু নিয়ে আপনার বক্তব্যটা কী দাঁড়াল?

আমি তোমাকে একটা ফরমাল সরকারি বয়ান দিয়ে দিচ্ছি। নট ইন্টারেস্টিং, নাথিং নিউ। তবে সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল সিগনিফিক্যান্স-এর অ্যাঙ্গেল থেকে বলা।

কিন্তু আপনার প্রকৃত বক্তব্যটা কি গোপনই থেকে যাবে?

না। রাইট ইট ইন ইয়োর অটোবায়োগ্রাফি। কিংবা রাইট ইট হোয়েন আই উইল নট বি ইন পাওয়ার। বাই দি বাই, তুমি রামায়ণ পড়েছ?

হ্যাঁ স্যার।

তুমি বাঙালি। বাঙালিদের বিশেষ রামভক্তি নেই। রামচন্দ্রজিকে তোমার কেমন লাগে?

ওয়ান্ডারফুল। খুব একটা বীর নয়, কিন্তু দোষেগুণে ভীষণ ইন্টারেস্টিং মানুষ।

জিতা রহো। দ্যাটস এনাফ।

রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, রামায়ণ গবেষক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বিরোধী পক্ষের বক্তব্য সমন্বিত সেতুসমুদ্রম নিয়ে দীর্ঘ লেখাটা আজ শেষ করল জহ্নু। কিন্তু শেষ করার পরও একটা রূপকথার মতো সম্মোহন তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল সারা দিন। ধনুষ্কোটির সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ অবলোকন করেছিল বিপুল জলরাশি। কল্পচক্ষে দেখে নিয়েছিল, জলের নীচেকার এক অপরিসর প্রস্তরপথ, যার নির্ভুল অবস্থান স্যাটেলাইট ক্যামেরায় বহুবার ধরা পড়েছে। রামসেতু, না প্রকৃতি, যেই হোক, একটি গোপন সেতুবন্ধন দু'টি স্থলভূমিকে ধরে আছে আজও। রামায়ণের আশ্চর্য বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে খানিকটা সময় লাগবে তার। বড় বেশি ডুবে ছিল ওই অপরূপ এক কাহিনিকাব্যে। রাতে স্বপ্ন দেখল, অশান্ত জলের মধ্যে সন্তর্পণে পা ফেলল সে। জলের নীচে অসমান পাথর, গোড়ালিডুব জল। এক পা এক পা করে করে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু জল বাড়ছে ক্রমে, গর্জন করছে সমুদ্র, আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে বিষধর সামুদ্রিক সাপ তাকে লক্ষ করতে করতে। একটা হাঙর জল থেকে মুখ তুলে এক চোখে তাকে দেখে রাখল। জল বাড়ছে। হঠাৎ তার বাঁ হাত চেপে ধরল বাঁধন, জল যে বাড়ছে! আমরা এখন কী করব গো? চিন্তিত জহ্নু সামনের অন্তহীন বিক্ষুব্ধ জলরাশির দিকে চেয়ে বলল, ভয় পেয়ো না। চোখের

আড়ালে একটা সেতু ঠিক আছে। সামনেই একজন লম্বা কিরাত জাতীয় মানুষ হঠাৎ ফিরে তাকাল তাদের দিকে। কাঁধে ধনুর্বাণ, মাথায় পিঙ্গল জটা, পরনে বল্কল, আর কী তীব্র চোখ! একখানা দীর্ঘ বাহু তুলে বলল, আছে। এসো, নির্ভয়ে পার হয়ে যাও....

অজস্র পাখির তীব্র ডাকে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল জহ্নুর। প্রথমটায় বুঝতেই পারল না, এসি লাগানো ঘরে হঠাৎ এত পাখির ডাক আসছে কোথা থেকে। তারপরই ভুল ভাঙল। এ তার নতুন মোবাইল ফোনের রিংটোন।

আমি শিশির রায়, দুর্গাপুর থেকে। মনে আছে কি আপনার?

হ্যাঁ বলুন।

আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম।

না, না, ঠিক আছে। কিছু বলবেন?

বলতে একটু সংকোচ হচ্ছে। কাল বাঁধন আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তার জবাব দিতে পারিনি।

-কী কথা?

জিজ্ঞেস করেছিল আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করি কি না।

ও।

আপনার সঙ্গে কথা বলে নাকি ওর হঠাৎ এই প্রশ্নটা মনে এসেছে। এই প্রশ্নটা কাল সারা রাত আমাকে ঘুমোতে দেয়নি। জবাবটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

অনেক দিন আগে একজন মানুষ তার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে

গোটা একটা সমুদ্রকে বেঁধে ফেলে সেতু রচনা করেছিল।

রামায়ণ? সে তো মিথ।

মিথ আমাদের কিছু বলতে চায় শিশিরবাবু। মিথের কিছু বলার আছে সব মানুষের কাছেই।

শিশির স্তব্ধ হয়ে রইল। কথা বলল না। শুধু তার শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

পাঁচ

তাজুর সন্দেহ হচ্ছে, তার চার্ম চলে যাচ্ছে না তো? বরাবর পুরুষমানুষ তার দিকে বার বার তাকায়, তাকিয়ে থাকে, মুগ্ধ হয়, পিছু নেয়, কাছে ঘেঁষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তার মোবাইলে কত মেসেজ জমা হয়ে আছে, কত ডিলিটেড হয়ে গেছে। কত ফোন এসেছে। কিছু রোমান্টিক, কিছু অশ্লীল। তা হোক। এসবই নানা ভাবে তার পক্ষে জমা হওয়া জনগণের ভোট। মুখশ্রী, শরীর, পোশাক, ব্যক্তিত্ব এসবের মিলিত বিচ্ছুরণ তার দিকে অভ্রান্ত ভাবে টেনে আনে সকলের চোখ ও মনোযোগ। তাজু জানে, তার প্রকাশ্যে আবির্ভূত হওয়া মানেই একটা ঘটনা। রাসবিহারী বা গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট বা পার্ক স্ট্রিট সর্বত্রই তার ভক্তরা ছড়িয়ে আছে। আজ অবধি একটিও উপেক্ষার ঘটনা নেই।

কিন্তু আজ নিউ মার্কেটে এটা কী হল তা একদম বুঝতে পারছে না তাজু। বেরোবার আগে দেড় ঘণ্টা ধরে সেজেছে সে। বলতে নেই, সাজতে সে জানেও। বার বার গোয়েন্দার মতো চোখে আয়নায় নিজেকে দেখেছে সে। কোথাও কোনও বিচ্যুতি নেই।

কেনাকাটা করার সাংঘাতিক নেশা আছে তার। প্রচুর কেনে, নষ্ট করে, বিলিয়ে দেয়। কত সেন্টের শিশি আজও খোলা হয়নি, কত শাড়ি বা পোশাকের পাট ভাঙা হয়নি, কত ক্রিম বা রূপটান বা দামি শ্যাম্পু পড়ে আছে তার ঘরে, কত ঝুটো বা আসল গয়না আজও পরা হয়নি তার। তবু না কিনলে তার পাগল-পাগল লাগে। বিশেষ করে এই দুপুরবেলাটায় একটু সব্জি সেদ্ধ, সুপ আর ঘোলের ডায়েট লাঞ্চ সেরে শপিং-এ না বেরোলে দিনটাই মাটি। আর এই দুপুরেই তার দিগ্বিজয়।

কয়েকটা প্রিয় দোকান আছে তার। আজ মলের দোকান ঘুরে ধীর পায়ে শোকেসগুলো দেখতে দেখতে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ভারী কিউট একটা হাতঘড়ি দেখে চোখ ফেরাতে পারল না। মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দাম।

দোকানটার ভিতরে অপেক্ষা করছিল আরও একটি কিউট বিস্ময়। ছ' ফুটের ওপর লম্বা, সাহেবের মতো ফর্সা, গ্রিক ভাস্কর্যের মতো মুখ আর কালো আঙুরের মতো থোকা থোকা কোঁকড়ানো চুলের এক হাস্যময় যুবক। কী চওড়া কাঁধ আর জোরালো দুটো বাহু! গায়ে একটা ক্যাজুয়াল হালকা ভায়োলেট-রঙা টি শার্ট, পরনে জিনস। এত শ্বাসরোধকারী পুরুষরূপ বহু কাল দেখেনি তাজু। বেশির ভাগ পুরুষকেই হেলায় জয় করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরিত্যাগ করে যায় তাজু।

আজ সেরকমটা হল না। মুখোমুখি হতেই অভ্যস্ত জাদুবিদ্যায় কটাক্ষ ও হাসিতে তার সম্মোহন নিক্ষেপ করেছিল তাজু।

কিন্তু প্রতিপক্ষ এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করল তার দিকে। ভ্রু একটু কোঁচকাল কি? ঠোঁটে কি সামান্য তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গের একটা টুইস্ট! দ্বিতীয়বার তার দিকে না তাকিয়ে একটা ওমেগা সি মাস্টার ঘড়ির দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়ল সে। ওই তুচ্ছ ঘড়িটার চেয়ে সে যে অনেক বেশি ইম্পট্যান্ট সেটা বার বার নানা অছিলায় বুঝিয়ে দিতে ছাড়ল না তাজু। কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে 'ওঃ সরি' বলে দুঃখ প্রকাশ করা, দোকানদারের সঙ্গে মিউজিক্যাল ভয়েসে নানা মজার কথা বলা এবং বার বার পাশ-চোখে তাকানো। গাড়ির চাবিটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়েছিল একবার। ছেলেটা কুড়িয়েও দিল। তাজুর ডগোমগো থ্যাংক ইউ-এর জবাবে সাদামাটা ইটস ওকে বলা ছাড়া আর কোনও উৎসাহ দেখাল না পর্যন্ত। ব্যর্থ, সব ব্যর্থ, অবশেষে ক্রেডিট কার্ডে ঘড়িটা কিনে ব্যাগে ভরে তেতো মনে বেরিয়ে এসে নিজস্ব মারুতি জেন-এ উঠে বসল সে। চোখ ফেটে জল আসছে। এসব কী হচ্ছে তার?

এখন শরৎকাল শুরু হয়-হয়। তেমন গরম নেই এবং তেল বাঁচিয়ে চলা উচিত জেনেও গাড়ির এসি অন করে দিল তাজু। বাইরের গরম না হোক, ভিতরের গরম তো আছে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রাগে একটা ঝটকা মেরে গাড়িটা বের করল সে। বিয়ের পর থেকেই তার চার্ম কমতে শুরু করেছে। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল সানফ্রান্সিসকোয় বসে-থাকা ওই লোকটার ওপর। ওই বাঘটাই তার সব গ্ল্যামার, তার চার্ম, তার সম্মোহন চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে।

একবার ফোন করবে লোকটাকে? মোবাইলের ঘড়িটা দেখে নিল সে। বেলা দেড়টা। তার মানে ওখানে এখন রাত বারোটা। থাক, হয়তো ঘুমিয়েছে। তা ছাড়া গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইলে কথা বললে আজকাল পুলিশ ধরছে।

কিন্তু যা-ই হোক, আসল কথাটা হল তাজুর মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই গ্ল্যামার চলে যাচ্ছে কি না। লোকে এখনও তাকায়, তাকিয়েও থাকে, পিছু নেয়, মেসেজ পাঠায় বটে, কিন্তু তার অশ্বমেধের ঘোড়া মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে।

শুধু বাইরের পুরুষরাই বা কেন, তার আজন্ম কাছের দু'টি পুরুষই বা তার নিয়ন্ত্রণে থাকছে কোথায়? বাবা বরাবর তাজুর কাছে বশ। তাজুর হাতের চায়ের নাকি অন্যরকম স্বাদ, তাজুর রান্না নাকি মায়ের রান্নাকে মনে পড়ায়, এইসব। দাদা ততটা বশ ছিল না বটে, কিন্তু শেষ অবধি গাঁইগুঁই করেও তাজুর কাছে হার মেনে নিত। কিন্তু আজকাল সেরকম হচ্ছে কই? বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন একটু পর-পর ভাব! মা অবশ্য বলছে, মোটেই তা নয়, তোর কথা সব সময়েই তো বলে! জহ্নু তো গেঞ্জি, জামা, রুমাল খুঁজে না পেলেই বলে, তাজুটার বিয়ে হয়ে সব গণ্ডগোল। আর তোর বাবা তোর ঘরে গিয়ে জিনিসপত্রের গন্ধ শোঁকে মন খারাপ লাগলে।

কথাগুলো মিথ্যে নয়। কিন্তু এই যে তার দাদা দিল্লি থেকে হঠাৎ কোনও মন্ত্রীর এন্টুরেজে বেজিং চলে গেল, যাওয়ার আগে একবারটি তাজুকে কি ফোন করে জানাতে পারত না? মা সাফাই দিচ্ছে, একদম সময় ছিল না, শেষ মুহূর্তে খুব তাড়াহুড়ো করে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাজু জানে, তা

নয়। আসলে সে এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। তাকে কারও মনেই পড়ে না। কাল রাতে বেজিং থেকে অবশ্য একটা ফোন করেছিল, জানিস তাজু, এখানে বেশ ঠান্ডা।

তাজু রাগ করে বলেছিল, বসে বসে ব্যাং ভাজা আর আরশোলার স্যুপ্ খা। আমাকে বলে যাসনি কেন?

সময় পেলাম কই? লাস্ট মোমেন্টে ভিসা পাওয়া গেল। খুব টেনশন যাচ্ছিল। রাগ করিস না, তোর জন্য সিল্কের কাপড় নিয়ে যাব।

কিচ্ছু চাই না। বিয়ে দিয়ে বিদেয় করেছিস, আর আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

আরে না। বলে আসতে পারিনি বলে আমারও খারাপ লাগছে।

রাগ আর অভিমান এখনও যায়নি তাজুর। তবে একটু কমেছে। তার দাদাটা আসলে ভাল মানুষ। একটু সরল সোজা, একটু বোকাও। ঠিক দাদাদের যেমন হওয়া উচিত তেমনই।

বিউটি পার্লারটা ছোট। কিন্তু ভীষণ এক্সপেনসিভ। গাড়িটা পার্ক করে ভিতরে ঢুকে ওয়েটিং রুমে বসে আনমনে কিছুক্ষণ একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাল সে। অনেক মডেলের ছবি। আজকালকার মডেলগুলোকে তেমন পছন্দ হয় না তাজুর। সাইজ জিরো, উপোসি চেহারা। তাজুর মেদ নেই, আবার সে হাড়গিলেও নয়।

সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে যেমন ঢেউ এসে পায়ে ভেঙে পড়ে, দোল দিয়ে যায়, তেমনি তার প্রতি নিবেদিত যত প্রেম, যত

স্তুতি সব আজও যেন পায়ে জলের মতো খেলা করে, দোলা দেয়। তাকে পানের নেশা ধরিয়েছিল জ্যাঠাইমা, সঙ্গে দামি একশ ষাট নম্বর জর্দা। স্ক্রেপ করাতে গেলে একদিন ডেন্টিস্ট বলেছিল, ম্যাডাম, পান খেলে দাঁতের হাইজিন বজায় রাখা কঠিন। সেই থেকে পান প্রায় ছেড়েই দিয়েছে তাজু। দিনে বড়জোর দুটো খায়। তাও শোওয়ার আগে দাঁত মাজে এবং নিয়মিত স্কেলিং করায়।

পেডিকিওর করাতে বসে বারবার ঘড়ির দোকানের সেই অসহনীয় সুন্দর আর অহংকারী পুরুষটাকে মনে পড়ছিল তার। পাত্তা দিল না কেন বলো তো! পাগল নয় তো! না কি হোমো? হোমোই হবে। অমন সুন্দর একটা ছেলের হোমো হওয়াটা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু তবু যেন হোমোই হয়। তাহলে অন্তত তাজুর প্রেস্টিজটা বাঁচে।

মোবাইলের আগেও একটা মোবাইলহীন প্রস্তরযুগ ছিল। তখন মোবাইল ছাড়া কী করে বেঁচে থাকত মানুষ কে জানে। সেই যুগটাকে একটুখানি মনেও আছে তাজুর। মনে হয় তখন নিস্তব্ধতা বড় বেশি ছিল। যে মেয়েটা পেডিকিওর করছিল সে কাজ করতে করতে দু'বার মোবাইলে কথা বলে নিল। ব্যাপারটা একটু বিরক্তিকর।

ম্যাগাজিন ওলটাতে ওলটাতে দোয়েলের শিস শুনে হাত বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে নম্বরটা দেখল সে। বাঁধন।

দিদি, ফোন করেছিলে?

ভ্যাট, দিদি কী রে? ক'দিন পর আমাকেই তো বউদি

ডাকতে হবে। সকালে ফোন ধরোনি কেন?

এ মা, যা কাণ্ড হয়েছে না। ভুলে মোবাইল ফেলে এক বান্ধবীর বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। একটু আগে ফিরে এসে দেখি চারটে মিস কল। একটা আবার বেজিং থেকে। ওই নম্বরে কল করে শুনি চিনা ভাষায় কী সব বলল। তারপর অবশ্য ইংরিজিতেও বলল। বেশির ভাগটাই বুঝতে পারিনি। বোধহয় বলল, ডেলিগেটরা কেউ এখন হোটেলে নেই।

ওখানে তো ওর মোবাইল কাজ করছে না নিশ্চয়ই। একটু বেশি রাতের দিকে করলে পাবে। আমাকেও কাল রাতে ফোন করেছিল। এমন পাজি, দুম করে বেজিং গেল, একবারও আমাকে বলে গেল না। তোমাকে?

আমাকেও হয়তো বলার সময় পেত না। আমি পরশু সকালে বাইচান্স ফোন করায় বলল। তখন খুব তাড়াহুড়ো ছিল। পরে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে খানিকক্ষণ কথা বলেছে। তুমি এখন কী করছ?

পেডিকিওর।

সেটা আবার কী?

জানো না বুঝি?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পায়ের ব্যাপার তো?

সাজগোজের যে কিছু জানো না সেটা দু'বার গিয়েই বুঝেছি। দাদা যেদিন দেখতে গিয়েছিল সেদিন তো—মা গো—কী বিচ্ছিরি সেজেছিলে! যেমন ম্যাড়ম্যাড়ে শাড়ি, তেমনি গাঁইয়া চুলবাঁধা, তার ওপর চেরি লিপস্টিক!

বাঁধন হেসে ফেলল। বলল, আমি সত্যিই সাজের কিছু

বুঝি না। কাঁকন বোঝে। আমি ভাবি সেজে কীই-বা হবে!

ও মাঃ ও কী কথা! সাজ নিয়ে সারা দুনিয়া তোলপাড় হচ্ছে! মেয়েটা বলে কী রে! অবশ্য তোমার না সাজলেও চলে, ভগবান রূপখানা তো ঢেলে দিয়েছেন!

যাঃ, তুমি আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

তাই বুঝি! আমি সুন্দরী নই, এ কথা বলছি না। কিন্তু একটু আগে নিউ মার্কেটে কী হল জানো?

কী হল? কেউ পিছু নিয়েছিল বুঝি?

আরে না। সে তো তবু ভাল। ঘড়ি পছন্দ করতে একটা দোকানে ঢুকে দেখি ভীষণ হ্যান্ডসাম একটা ছেলে ঘড়ি কিনছে। কী বলব তোমাকে, যেন অ্যাডোনিস। আজ অবধি কোনও পুরুষ আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই ছেলেটা এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল যে আমার ভীষণ ইনসালটিং লাগছিল।

হয়তো ছেলেটা লাজুক।

লাজুক আমি খুব চিনি। লাজুকরা সরাসরি না তাকালেও আড়ে আড়ে চায়। না, এ তা নয়। বেশ কিছুক্ষণ আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলেটা আমাকে একদম পাত্তা দিল না। মজা করার জন্য পায়ের কাছে গাড়ির চাবি ফেলে দিলাম। সেটা কুড়িয়েও দিল, কিন্তু থ্যাংক ইউ-এর উত্তরে মাছি তাড়ানোর মতো করে বলল, ইটস ওকে। বলো কোন সুন্দরীর না রাগ হবে! তারপর অনেকক্ষণ ভেবে মনে হল, ছেলেটা নিশ্চয়ই হোমো।

এ মা! সত্যি?

সত্যি কি না কে জানে! তবে হোমোদের কাছে সুন্দরীদের কোনও অ্যাপিল নেই, জানো তো?

আচ্ছা, সুন্দরীদের অ্যাপিল তো একদিন ভীষণ কমে যেতে পারে! সেদিন কী হবে?

ও মা! সুন্দরীদের অ্যাপিল কমবে কী রে? চিরকাল মেয়েদের রূপ নিয়ে কত কাব্য হচ্ছে, কত যুদ্ধ হল, কত লোক দেবদাস বা সাধু হয়ে গেল!

কিন্তু এরকম ঘটনা তো ঘটতেও পারে।

কীভাবে?

আমার বাবা তো খুব মজার মানুষ। সেদিন বলছিল, মেডিক্যাল সায়েন্স যেভাবে এগোচ্ছে তাতে শিগগিরই অর্থোডোন্টিক আর কসমেটিক সার্জারি করে যে-কোনও মেয়েকে সুচিত্রা সেন বা ঐশ্বর্যা রাই করে তোলা যাবে। সেদিন আর কুৎসিত বলে কেউ থাকবে না। সর্বত্র দেখা যাবে হাজার হাজার সুচিত্রা সেন, ঐশ্বর্যা রাই আর মাধুরী দীক্ষিতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন কী হবে বলো তো! সুন্দরী দেখে দেখে লোকের চোখ পচে যাবে, কেউ আর তাদের দিকে ফিরে তাকাবে না, আওয়াজ দেবে না, পিছু নেবে না, এস এম এস করবে না। তখন পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনে লেখা হবে, প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা ও কুৎসিত পাত্রী চাই।

যাঃ! তুমি খুব ফাজিল আছ!

বাবা মজা করে বলেছিল বটে, কিন্তু আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভেবেছি। ওরকম হলে কিন্তু বেশ হবে, না?

মোটেই না। সার্জারি করে সুন্দর হওয়া আর জেনেটিক্যালি

সুন্দরের মধ্যে তফাত থাকবেই। এই, দাদা কী বলেছে জানো? তোমার মতো সুন্দরীকে নাকি আমাদের বাড়িতে মানাবে না। শোনো কথা! আমার মা কি কম সুন্দরী, বলো! একটু ছোটখাটো চেহারা ঠিকই, কিন্তু শি স্টিল লুকস সো ইয়ং! এখনও পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে!

উনি ভীষণ, ভীষণ সুন্দর। আমি ওর পাশে দাঁড়াতেই পারি না।

না বাপু, সেটা বাড়াবাড়ি হবে। তুমিও ভীষণ, ভীষণ সুন্দর। আর গজলখানা যা গেয়েছিলে, বাবা আর মহীদা ওখানেই দিওয়ানা হয়ে গেছে।

আমার মনে হয়, এই বিয়েতে তোমার দাদার মত নেই।

কী বলে রে! সত্যি? দাদা কী বলেছে তোমাকে বলো!

বিয়ের কথা তো হয়নি। অন্য কথা হয়।

কী কথা হয়?

আমরা তো খুব বন্ধু হয়ে গেছি। এক কথা থেকে আর এক কথা হতে থাকে।

ভাব-ভালবাসার কথা হয় না?

না। ও খুব ভাল বন্ধু কিন্তু।

আজকাল আর ভাব-ভালবাসার কথা কে-ই বা বলে। একগাদা মিথ্যে কথা ছাড়া তো কিছু নয়। আমার বরের সঙ্গেও তো আমার বিয়ের আগে ভালবাসার কথার চেয়ে ঝগড়াই হত বেশি।

আমাদের অবশ্য ঝগড়া হয় না।

দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও সুখ নেই। ভীষণ প্যাসিভ

আর খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। ঝগড়ার পরিস্থিতি হলেই গুটিয়ে যায়।

তোমাকে খুব ভয় পায়, না?

আগে পেত। আজকাল পাত্তাই দেয় না। বাবাও তাই। বিয়ের পরই একদম পর করে দিয়েছে ভাই।

যাঃ। তোমাদের ভাইবোনের সম্পর্ক তো ভীষণ ভাল।

কিসের ভাল বলো তো! এই যে বেজিং গেল একবার জানিয়েও গেল না আমাকে! এত রাগ আর অভিমান হয়েছিল না! কাল রাতে যখন ফোন করল তখন রাগ করে বলে দিয়েছি ব্যাঙ ভাজা খা, আরশোলা খা।

বাঁধন হিহি করে হেসে ফেলল, মা গো! সত্যিই ওসব খেতে হয় নাকি ওখানে?

কে জানে! তবে শুনেছি ওরা কুকুর বেড়াল সব খায়।

একটা কথা বলব তোমাকে? কিছু মনে করবে না?

ও মা! অত ভণিতা কিসের? বলো।

জহ্নুকে, তোমাকে, তোমাদের সবাইকেই আমার ভীষণ ভাল লাগে।

সে তো তোমাদেরও আমার, আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ।

তাই বলছি, যদি বাইচান্স বিয়েটা না হয় তাহলে সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়ো না, প্লিজ!

ওটা আবার কী কথা! বিয়ে হবে না মানে? নিশ্চয়ই হবে। দাদার কথা ছাড়ো তো! দাদা ওরকমই, ভীষণ ব্রুডিং নেচার। একটা কাজ করার আগে দশবার আগুপিছু করবে।

তোমরা যদি জোর করে ওর ঘাড়ে বিয়েটা চাপিয়ে দাও তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

একটু চুপ করে থেকে তাজু গলাটা নামিয়ে বলল, একটা সত্যি কথা বলবে বাঁধন?

কী বলব?

দাদা সত্যিই কি তোমাকে বলেছে যে, এই বিয়েতে ও রাজি নয়?

সব কথা কি অত স্পষ্ট করে বলতে হয়? তবে বোঝা যায়।

তুমি কিন্তু আমাকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলে!

কেন, দুশ্চিন্তার কী আছে? ওর নিশ্চয়ই ভাল বিয়ে হয়ে যাবে।

তা হয়তো হবে। কিন্তু আমি ভাবছি তোমাকেই বা ও বিয়ে করতে রাজি নয় কেন? আমি যত দূর জানি ওর কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই। থাকলে আমি জানতে পারতাম। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কোনও ডেভেলপমেন্ট হল কি না। এখন তো আমি পর, আমাকে না-ও বলতে পারে।

না, ওর কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই। আমি জানি।

এতই যদি জানো তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না কেন সেটা কেন জানো না? একটা কথা বলবে?

কী কথা!

কোনও কারণে আপত্তিটা তোমাদের দিক থেকে ওঠেনি তো?

না। একেবারেই না। মা বাবা এই বিয়ের প্রস্তাবে ভীষণ খুশি।

তাহলে এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে?

আর-একদিন তোমাকে হয়তো বলতে পারব। ও বেজিং থেকে ফিরুক। ওর সঙ্গে আরও একটু কথা বলে নিই। তারপর।

ঠিক আছে। কিন্তু ততদিন টেনশনে থাকব। মনে রেখো।

বিয়ে না হলেও ওর বন্ধুত্বটা আমি চাই। এত ভাল বন্ধু আমার কেউ নেই।

আহা রে! ওভাবে বলে না। বলতে নেই। তুমি ভেবো না বাঁধন। আমার মন বলছে তোমাদের ঠিক বিয়ে হয়ে যাবে। দাদার সঙ্গে আমিও কথা বলব।

ওকে ফোর্স কোরো না, প্লিজ।

না, ফোর্স করব না। আমার সেই জোর আর নেই।

পেডিকিওরের পর গাড়ি চালিয়ে সোজা বাপের বাড়িতে এল তাজু। ঘরে ঢুকে মাকে দেখেই রাগে ফেটে পড়ে বলল, এসব কী হচ্ছে মা?

চিত্রাঙ্গদার ইশারায় সে খেয়াল করল, বৈঠকখানায় একজন সাদামাটা চেহারার ভদ্রমহিলা বসে আছে।

চিত্রাঙ্গদা একটু অপ্রস্তুত হাসি মুখে বলে, এ হল প্রণতি, আমাদের জয়ন্ত রায়ের স্ত্রী। ওর ভাইঝি নাকি পরমাসুন্দরী। জহ্নুর সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চায়।

অবাক তাজু বলে, দাদার সঙ্গে?

হ্যাঁ। জহ্নু তো দুর্গাপুরে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

ও।

সামনের রোববার আমরা দেখতে যাব।

তাজু একটা দায়সারা 'আচ্ছা' বলে নিজের ঘরটায় এল। ঘরটা তার জন্যই এখনও সাজানো আছে। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে সে চোখ বুজল। মনটা বড্ড খারাপ লাগছে।

ছয়

আজ আঠেরো বছর ট্রেন চালাচ্ছে মণিরাম। আঠেরো বছরে রানওভার কেস সর্বসাকুল্যে দুটো। যখন ব্যালাস্ট ট্রেন চালাত তখন কাটোয়া লাইনে একটা ঘোমটা দেওয়া গেঁয়ো বউ ভরসন্ধেবেলা ঝাঁপ খেয়েছিল ইঞ্জিনের সামনে। ট্রেন থামানোর কোনও উপায় ছিল না। স্টিম ব্রেক চেপে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল বটে। তার সিনিয়র বুড়ো ড্রাইভার অখিলেশ গম্ভীর হয়ে বলল, থামাসনি। টেনে যা। মরতে চায় তো আমরা কী করতে পারি বল? দ্বিতীয়টা ঝাঁপ খেয়ে নয়। পাকুড় স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এ একটা বুড়ো মানুষ থলি থেকে পড়ে-যাওয়া কুমড়োর ফালি তুলতে গিয়ে মাথায় ইঞ্জিনের বাফারের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল। ঠিক রানওভার নয় বটে, কিন্তু অক্কা পেয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

এখন মণিরাম পাকা ড্রাইভার। এক্সপ্রেস চালায়। এখন মণিরাম জানে ট্রেনের তলায় যদি কেউ মরতে চায় তো ড্রাইভারের করার কিছু নেই। আর পাবলিকও এটা জানে। আর সেই জন্যই রানওভার হলে পাবলিক ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ধরে পেটায় না।

বেশ একটু রাতেই দুর্গাপুর ছেড়ে স্পিড তুলছিল মণিরাম। হঠাৎ হেডলাইটের সুড়ঙ্গের মতো আলোয় অনেকটা দূরে একটা সন্দেহজনক ব্যাপার দেখতে পেল সে। রেল আগের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক এখন। কে কোথায় ফিশপ্লেট সরিয়ে নেয়, লাইন উড়িয়ে দেয় বা মাইন পেতে রাখে কে জানে। একটা কালোমতো কী যেন আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছিল। ঠাহর হচ্ছিল না ঠিক। অভিজ্ঞ মণিরাম ব্রেক দিতে শুরু করল, স্পিড কমাল। ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট মাধব দাসকে বলল, দ্যাখ তো, ওটা কী। তোর চোখের জোর বেশি।

মাধব উঁকি মেরে বলল, একটা লোক পড়ে আছে মনে হচ্ছে। হয়ে গেছে কি না কে জানে। ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

ট্রেনটা গড়িয়ে কাছ বরাবর এনে দাঁড় করাল মণিরাম। তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। চালিয়ে নিয়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না। রানওভার নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। একটা রিপোর্ট দিলেই হয়। বাদবাকি রেল-পুলিশ বুঝবে। কিন্তু আরও একটা পাপ তার নামে ওপরওলার দরবারে জমা হোক এটা মণিরাম চায় না। পঞ্চাশ বছর বয়স হল তার। ওপরের দিকটাও তো ভাবতে হবে।

তার আগমন টের পেয়ে লোকটা উঠে বসল। মরেনি বটে, কিন্তু মড়ার মতোই মুখচোখ। ফ্যাকাসে সাদা, চোখে জল, মুখ ভ্যাবলা।

একটা চড় তুলেছিল মণিরাম, জিবের ডগায় একটা খারাপ গালাগাল নাচছিল। ভদ্রলোকের মতো চেহারা দেখে অতটা করতে পারল না। চড়টা নামিয়ে নিল, গালাগালটাও গিলে

ফেলল। শুধু ধমকের গলায় বলল, কী হচ্ছিল এখানে?

কথা বলার মতো অবস্থা নয় লোকটার। দু'হাতে মুখটা ঢেকে শুধু মাথা নাড়া দিল। তাতে কিছু বোঝা গেল না। আসলে এসব সময়ে তো লোকের কোনও বক্তব্যও থাকে না। মরতে না পারা আর ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাও তো আছে। মণিরামের বয়স হয়েছে, এখন সে মানুষের নানা ব্যথা বেদনা আর হতাশার কথা জানে।

গা ঢাকার কালো চাদরটা খসে গিয়েছিল কাঁধ থেকে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লোকটা কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল।

মণিরাম কটমট করে তার দিকে চেয়ে বলল, মরার জন্য এই লাইনে অনেক ট্রেন পাবেন। সঙ্গে বউ-বাচ্চাগুলোকেও নিয়ে আসবেন, বুড়ো বাপ-মা থাকলে তাদেরও। আপনি একা মরে জ্বালা জুড়োলে তো হবে না ভাই। তাদের যে জ্বালা শুরু হবে তা জুড়োবে কে?

লোকটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মণিরাম একটা ধমক দিল, যান বাড়ি যান।

লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে ঢালু দিয়ে নেমে গেল। নীচে একটা সাইকেল কেতরে পড়ে ছিল। সেইটে দাঁড় করিয়ে ঠেলে রাস্তার দিকে চলে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মণিরাম বলল, শালা!

রাগ বা অভিমান হলে দেবীর তিনটে লক্ষণ ছিল। মুখে কথা নেই, হাসি নেই, চোখ সব সময়েই নত। আর সেই সময়ে একজন অতি বাধ্য ও অনুগত ক্রীতদাসীর মতো, শিশির যা হুকুম করত তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করত। ঠিক যেন পুতুল। কিন্তু মুখের দিকে তাকাবে না, কিছুতেই হাসবে না এবং একটাও কথা বলবে না। কোনও প্রতিবাদ নয়, কথা শোনানো নয়, কিচ্ছু নয়। সব সময়েই সেই স্থিতাবস্থা ভাঙত একটি সঘন আবেগাপ্লুত এবং খানিকটা হিংস্র রতিক্রিয়ার পর। হয়তো-বা ধর্ষিতা হওয়ার একটি গোপন ইচ্ছাও ওই পুঞ্জীভূত অভিমানের পিছনে থাকতে পারে।

আজ বৃষ্টিভেজা কাঁচা রাস্তায় অন্ধকারে সাইকেল চালাতে বড় টালমাটাল হচ্ছিল শিশির। বহুদিন সাইকেল চালানোর অভ্যাস নেই। চার বছর আগে মোটরবাইক কেনার পর থেকে সাইকেলখানা পড়েই থাকে ভিতরের দরদালানের একপাশে। আজ বের করেছিল। বার বার হ্যান্ডেল বেঁকে যাচ্ছে, ব্যালান্স থাকছে না। হাত পা-ও তো বশে নেই আজ। দুপুর থেকে এত রাত অবধি কিছুই খায়নি সে। জলতেষ্টায় বুক শুকিয়ে আছে। পাপোশের মতো খড়খড় করছে জিব।

বড্ড অপমান হল। বড় গ্লানি। চোখ দুটো জ্বালা করছে। অম্বল হয়েছে খুব। পেট ডাকছে।

কত কথাই উড়ে আসছে মনে।

ছেলে পড়াতে বসলে রাত হয়ে যেত রোজ। আর রান্না সেরে বই পড়তে পড়তে বা উল বুনতে বুনতে রোজ ঘুমিয়ে পড়ত দেবী। আর সে কী গভীর ঘুম। রোজ ঠেলেঠুলে তুলে

চোখে জলের ঝাপটা দিইয়েও সে ঘুম পুরোপুরি ভাঙত না। আর ঘুমের আলিস্যিতে কিছুতেই রাতে খেতে চাইত না সে। তখন শিশির তাকে জাপটে ধরে বুকে চেপে এক থালা থেকে নিজে খেত, দেবীকেও খাইয়ে দিত। আর সেটা এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বড় ছেলে হওয়ার পরও, জেগে থাকা অবস্থাতেও নির্লজ্জের মতো বরের হাতেই খেত দেবী।

রাস্তার মাঝখানে বড় একটা গর্তে জল জমে ছিল। আধো অন্ধকারে দেখতে পায়নি ভাল করে। সামনের চাকাটা গর্তে পড়ে যেতেই সাইকেল উল্টে ছিটকে পড়ল শিশির। ডান হাতের তেলো ঘষটে গেল কাঁকুড়ে মাটিতে, মাথাটা দড়াম করে কোথায় লাগল কে জানে। চোখ অন্ধকার হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকল সে। তারপর খুব ধীরে উঠে বসল। শরীরটা ঝনঝন করছে ব্যথা বেদনায়। মাথা ঘুরছে।

শরীর যে কত বড় বোঝা সেটা এত দিন টের পায়নি সে। আজ পেল। এতক্ষণে তার দ্বিখণ্ডিত বোধহীন শরীরটার পড়ে থাকার কথা ডাউন লাইনে, অবহেলায়, অনাদরে, পাথরে লোহায় ছত্রভঙ্গ হয়ে। তা হল না। এখন ফেরত পাওয়া শরীরটা আর বইতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ জলকাদার মধ্যেই রাস্তায় বসে রইল সে। প্যান্ট-শার্ট ভিজে যাচ্ছে, কাদায় মাখামাখি হচ্ছে। তবু তার কোনও তৎপরতা নেই। তাগিদ নেই। এলাকাটা জনশূন্য বলে কেউ এসে দাঁড়ায়নি কাছে বা বিরক্তিকর সমবেদনা জানায়নি।

একটু দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সাইকেলটা টেনে তুলতে যেন পাহাড় ঠেলার পরিশ্রম। কিন্তু সাইকেলে উঠতে গিয়ে

দেখল সামনের চাকার রিমটা টাল খেয়ে গেছে। চালানো দূরের কথা, এই সাইকেল ঠেলেও নেওয়া যাবে না। ছেঁচড়ে নিতে হবে। কে অত পরিশ্রম করবে এখন। রাস্তার পাশে একটা অন্ধকার গাছের গায়ে সাইকেলখানা হেলিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে সে হাঁটতে লাগল। সাইকেলখানা অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। কিন্তু এখন এই সব মায়া মমতা ছাড়ার সময় হয়েছে।

হাঁটতে গিয়ে টের পেল, হাঁটুতে চোট হয়েছে, চটির স্ট্র্যাপ গেছে ছিঁড়ে, কোমড় অসাড়। চটিজোড়া অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। বাড়ি এখনও অনেক দূর। কখন পৌঁছোতে পারবে কিংবা আদৌ পারবে কি না তার কোনও ঠিক নেই। আর পৌঁছেই বা কী লাভ? সেখানেও তো এক শূন্যতাই বসে আছে তার জন্য।

মোড়ের মাথায় একটা রিকশাওলা চিনতে পারল তাকে। এত রাতে রিকশার চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে। এ লোকটা সওয়ারি নামিয়ে ফাঁকা রিকশা নিয়ে ফিরছিল। তাকে দেখে ব্রেক কষে বলল, আরে মাস্টারমশাই, এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার! অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

শিশির মাথা নেড়ে বলল, হুঁ।

আসুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রিকশায় লোকটাই ধরে ধরে তুলল তাকে, ইস, আপনার হাত দিয়ে তো খুব রক্ত পড়ছে! ঘাড়ে রক্ত, প্যান্টে রক্ত! কী হয়েছিল মাস্টারমশাই?

সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

গা এলিয়ে বসে রইল শিশির। হাওয়ায় শরীর শিরশির করছে ঠান্ডায়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সচকিত হল শিশির। তার বাড়ির সামনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বড় রকমের জটলা, কিছু হল নাকি?

রিকশা থামতেই লোকজন ছুটে এসে ঘিরে ধরল তাকে। তার ছাত্র-ছাত্রী, পাড়া-প্রতিবেশী, চেনাজানা সবাই।

কী হয়েছিল মাস্টারমশাই? কোথায় গিয়েছিলেন? বাড়িতে যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে!

এত লোকের চোখের সামনে বড্ড কুঁকড়ে গেল শিশির।

রিকশাওয়ালাই বলল, সাইকেল উলটে পড়ে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই।

একরকম ধরাধরি করেই তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেবীর বিছানায় মা'কে আঁকড়ে ধরে দু'টি শিশু। দশ বছরের নয়ন আর তিন বছরের চয়ন।

দেবী কাঁদছিল। তাকে দেখে ডুকরে উঠল, এ কী অবস্থা তোমার? কী হয়েছে? কীভাবে হল?

শিশির মড়ার মতো একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, পড়ে গিয়েছিলাম। চোট মারাত্মক নয়। কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘরভর্তি লোকের আহা উঁহু, সমবেদনা, উপদেশ আর কথা শেষ হতে অনেকটা সময় গেল। শরীরের তীব্র বিকলতা নিয়ে শিশির আর পারছিল না। কোনওক্রমে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পালটে সে তার বাইরের ঘরের বিছানায় ওপড়ানো

গাছের মতো পড়ে রইল নিথর হয়ে। ঘুম নয়, কিন্তু এক গভীর আচ্ছন্নতা ঢেকে ফেলল তাকে।

কে যেন বলেছিল তাকে, ব্যক্তিগত মালিকানা হারাতে কি মানুষ পছন্দ করে? আপনি তাকে বাধ্য করতে পারেন, সম্মত করাতে পারেন না। বলেছিল, একে অন্যের এলাকা দখল করা মানুষের পুরোনো অভ্যাস। আর এই প্রবণতাই যত অশান্তির মূল। বলেছিল, ল অ্যান্ড অর্ডার এক অলীক কল্পনা মাত্র। কোনও মানুষই ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ ল অ্যান্ড অর্ডার মানতে চায় না। সুযোগ পেলেই চোখের আড়ালে সে ল অ্যান্ড অর্ডার লঙ্ঘন করে। পুলিশ, উকিল, বিচারপতিও।

কে বলেছিল? জহ্নু? প্রজ্ঞানবাবু? বিভ্রান্ত মাথায় ঠিক মনে পড়ল না। এই কথাগুলোর সঙ্গে কোন গোপন সূত্রে আজ রাতে তার জীবনের যোগাযোগ রচিত হল। এই দ্ব্যর্থবাচক কথা তাকে যেন বারংবার সতর্ক করে দিতে চায়। কিশোর বয়সে পরির মতো যে বালিকাটি সুমুখের ওই রাস্তাটা দিয়ে স্কুলে পড়তে যেত সে আজ তার তেলহীন রুক্ষ কটা চুলে মুখ ঢেকে শীর্ণ শরীর নিয়ে পড়ে থেকে মৃত্যুর পল গোনে। একটি উড়োজাহাজ বহু দূরের বিষণ্ণ ডাক দিয়ে মস্ত আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। মানুষ বার বার সীমানা লঙ্ঘন করে, হারায় তার যা কিছু নিজস্ব জিনিস। বাধ্য হয়ে অন্যের জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ফেরে। সেই কবে ডেসডিমোনাকে ভুল করে মেরে ফেলেছিল ওথেলো। সে তো বাইরের নাটক। কত ডেসডিমোনাকে হৃদয়ের মধ্যে আজও খুন করে ওথেলো!

সকালে ভিতরের বারান্দায় কাদামাখা জামাপ্যান্টের পাশে

বসে ছিল দেবী। হাতে একখানা একসারসাইজ বুকের ছেঁড়া পাতা। তাকে দেখে ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে খুব করুণ গলায় বলল, এ কাগজখানা তোমার বুকপকেটে ছিল। কাচতে দিতে গিয়ে পেলাম।

শিশির চোখ সরিয়ে নিল। কিছু বলল না।

তোমার সুইসাইড নোট।

শিশির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খুবই লজ্জার কথা, সে মরেনি।

দেবী তেমনি নিরুত্তাপ করুণ গলায় বলে, আমার ক্যানসার। বেশি দিন বাঁচব না। তুমিও যদি মরে যাও, তাহলে আমার বাচ্চা দুটোকে কে দেখবে গো? ওরা কোথায় ভেসে যাবে?

শিশির একটু কেঁপে উঠল।

তার চেয়ে তুমি বরং বাঁধনকেই বিয়ে করো। বেঁচে থাকো। পায়ে পড়ি, মোরো না।

শিশিরের মাথাটা এখনও স্তম্ভিত। কিছু বলতে চাইলেও কোনও অর্থবহ কথা আসছে না। সত্য না, মিথ্যেও না। ঘাড় হেঁট করে রইল শুধু।

খুব আবেগহীন ক্লান্ত গলায় দেবী বলল, আগে মরা কত সহজ ছিল। কতবার মরে যেতে ইচ্ছে হত। কিন্তু এখন মরণ যত ঘনিয়ে আসছে তত যেন মরতে বড় ভয় হয় আমার। নইলে বাঁধনের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে কি দেরি হত?

শিশির মুখ খুলতে গিয়ে ফের টের পেল, কোনও কথা আসছে না তার। সাফাই নয়, স্তোকবাক্য নয়, সত্যি নয়, মিথ্যে নয়। চোখে জল এল না, দুঃখ হল না। কিন্তু লম্বা

একটা সিগারেট যেন বুকের ভিতরে খুব ধীরে জ্বলে যাচ্ছে। তার দহন-জ্বালা। সে ধীরে ধীরে কষ্টের শরীর টেনে তার বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। সংজ্ঞা হারাল তারপর।

অল্পবয়সি, বুদ্ধিমান ডাক্তারটি খানিকক্ষণ যেন একটু কৌতুকের চোখেই তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, চিকিৎসার জন্য বোম্বেতে নিয়ে যেতে চান? বেশ তো। কিন্তু ওখানে আলাদা কিছু কি পাবেন? এ রোগের চিকিৎসা সব জায়গাতেই একটা রুটিন ফলো করেই হয়।

কিন্তু শুনেছি—

ঠিকই শুনেছেন। ওদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক ভাল। কিন্তু আপনার স্ত্রীর রোগটা প্রথম স্টেজেই ধরা পড়েছে। ট্রিটমেন্টে উনি চমৎকার রেসপন্ডও করছেন। আমি সবে বিদেশ থেকে ফিরেছি। এটা আমার প্রথম কেস। কাজেই আপনার স্ত্রীর ট্রিটমেন্ট আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

আপনি কি গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে, উনি রিকভার করবেন?

গ্যারান্টি দেওয়ার আমি কে? হয়তো ঈশ্বর পারেন। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, নাইনটি নাইন পারসেন্ট সম্ভাবনা ওর ফুল রিকভারির।

তাহলে টাটা মেমোরিয়ালে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই?

সামনের নভেম্বর মাসে আমি টাটা মেমোরিয়ালে জয়েন করব। সেখানেও আমাদের মতো ডাক্তাররাই চিকিৎসা করে।

তবু সান্ত্বনার জন্য নিয়ে যেতেই পারেন। একগাদা টাকা খরচ হবে আপনার। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, এখানে ওঁর কোনও চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। ওঁর ম্যালিগন্যান্সি স্প্রেড করেনি। এমনকী অপারেশনেরও প্রয়োজন নেই।

আমার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই, বাচ্চা দুটো মাইনর। বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থাটা কীরকম।

আপনার স্ত্রীও এ কথাটা বলেছেন। যদি ভরসা রাখতে পারেন তাহলেই এখানে ট্রিটমেন্ট করাবেন।

আপনি কিছু মনে করলেন না তো?

আরে না। পেশেন্টের বাড়ির লোকের মনের অবস্থা আমি ভালই জানি। আমার বাবা ইউরিয়ায় মারা গিয়েছিলেন। তখন দিনরাত বাবার কাছে থাকতাম, দিনের মধ্যে কতবার যে ডাক্তারকে ফোন করতাম তার হিসেব নেই। ডাক্তার বিরক্ত হতেন। কিন্তু আমার উদ্বেগটা তো উনি বুঝতেন না।

আমার স্ত্রীর ভালমন্দের ভার আপনিই নিন। আমি আর টেনশন সহ্য করতে পারছি না।

ডোন্ট ওরি। শি হ্যাজ ইমপ্রুভড ইনরমাসলি। আর দুটো কেমো হয়ে গেলে, আমার ধারণা ম্যালিগন্যান্সিটা পুরোপুরি ইরাডিকেটেড হয়ে যাবে।

আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব!

ওসব জানাবেন কেন? একজন রুগিকে ভাল করতে পারলে একজন ডাক্তারও যে একস্টাটিক আনন্দ পায় সেটা কি আপনি জানেন?

তাহলে আজ আসি?

আসুন। বাই দি ওয়ে, আপনার স্ত্রী একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা। এই অসুখটা ওর অনেকটা কেড়ে নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু আফটার রিকভারি শি উইল রিগেন হার ওল্ড চার্ম। দেখবেন।

করুণ একটু হাসল শিশির। সব কি আর ফিরে পাওয়া যায়? ডাক্তার জানে না, কত হিসেব উলটেপালটে গেছে জীবনে। হৃদয়ের মধ্যে আজও প্রত্যক্ষ হয় ডেসডিমোনার মৃতদেহ। তাকে জাগাবে কোন জিয়নকাঠি?

আজকাল শীত পড়ছে অল্পসল্প। সামনের মাঠটায় সন্ধের পর কুয়াশা জমে থাকে। ফাঁকা মাঠের ওপর ওই কুয়াশা শূন্যতাকে মায়াময় আবরণে ঢেকে রেখে দেয় বুঝি। কিংবা ওই হয়তো কুয়াশারই এক মহাকায় জলপ্রপাত। দূরে নায়াগ্রার শব্দ কি কানে আসে তার? ডাকে, নায়াগ্রা ডাকে, উড়োজাহাজ ডাকে, দূর এসে বারবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় জানালায়। তার অভ্যন্তর থেকে একটা সাড়া উঠে আসতে চায়, যাই! মোর ডানা নাই...হায়, মোর ডানা নাই...

আজকাল বাঁধনের আসা বারণ হয়েছে। ফোন নেই একবারও। আজকাল বড় মন দিয়ে পড়ায় শিশির। অনেকক্ষণ পড়ায়। ডুবে যায় পাঠ্য বইয়ের পাতায়। একটু অবসর পেলে দেশ-বিদেশের অঙ্কের বই নিয়ে বসে যায়। আজকাল বিছানা ছেড়ে উঠে টুকটুক করে সংসারের কাজ করে দেবী।

চোখাচোখি হয় খুব কম, কথা আরও কম।

মাসখানেক বাদে একদিন অনেক রাতে বাঁধনের অপ্রত্যাশিত একটা ফোন এল। গলাটা শুনেই হড়কা বানের মতো একটা আনন্দ উঠে এসে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে দিল তাকে।

শিশিরদা, আপনি আজও আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেননি। অথচ জবাবটা জানা আমার ভীষণ দরকার।

কী প্রশ্ন বলো!

আপনি কি আমার জন্য আপনার স্ত্রীর মৃত্যু কখনও কামনা করেছিলেন?

কেন জানতে চাও বাঁধন?

এই প্রশ্নের জবাবের ওপর আমার একটা সিদ্ধান্ত নির্ভর করে আছে শিশিরদা।

কিসের সিদ্ধান্ত?

জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত...।

সব সত্যি কি উচ্চারণ করার মতো?

সত্যিটাই আমার জানা দরকার। ভীষণ ভাবে দরকার।

কোনও কোনও সত্য উচ্চারণ করলেই প্রলয় ঘটে যায়।

এই হেঁয়ালির ভিতরে জবাবটা রয়েছে শিশিরদা। তবু উচ্চারণ করা ভাল। বলুন।

হ্যাঁ, আমি দেবীর মৃত্যু কামনা করেছি। এমনকী মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার কথাও ভেবেছি।

ধন্যবাদ মাস্টারমশাই।

স্তব্ধ ফোনটার দিকে চেয়ে আধো অন্ধকারে বাঁধনের

মুখটা দেখতে পেল শিশির। দুটো বড় বড় মায়াময় চোখে যে সম্মোহন বাস করত এত দিন, তা এইমাত্র কেটে গেল। উপজাত হল এক আগ্রাসী ঘৃণা।

সেটা উপভোগই করল শিশির। অন্ধ চড়াইপাখির মতো অন্ধকার ঘরে ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় ঠক্কর খেতে লাগল একটি বাক্য, ধন্যবাদ মাস্টারমশাই...ধন্যবাদ মাস্টারমশাই...ধন্যবাদ মাস্টারমশাই।

যেন জেটি ছেড়ে গেল একটা জাহাজ। মাঝখানে হু-হু করে ঢুকে পড়ল শূন্যতা এবং কল্লোলিত জলরাশি।

দু' ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে রাখে দেবী। কেন রাখে কে জানে। মধ্যরাতে শিশির চৌকাঠ লঙ্ঘন করবে ভয়ে? তাই হবে হয়তো।

আপনাকে আবার ডিস্টার্ব করলাম।

ডিস্টার্ব করেননি। বলুন। আমি জেগে আছি।

আপনাকে সর্বদাই জাগ্রত মনে হয়। আমিই হয়তো ঘুমিয়ে আছি।

একটু হাসল জহ্নু।

আপনাকে একটা খবর দিই। আমার স্ত্রী ভাল হয়ে যাবেন। ডাক্তার বলেছে প্রাণের ভয় নেই।

বেঁচে থাকাটা যে কত ভাল তা যদি মানুষ জানত।

হ্যাঁ। বেঁচে থাকাটা, নিতান্ত বেঁচে থাকাটাও বড় দরকার। আর একটা কথা। বাঁধন আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল, মনে আছে?

আছে। আপনি আপনার স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করেন কি না।

হ্যাঁ। একটু আগে টেলিফোনে আমাকে আজও প্রশ্নটা করেছিল বাঁধন। অনেক দিন পর ফোন করল।

আপনি কী বললেন?

বললাম, হ্যাঁ, মৃত্যু কামনা করেছি। মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার কথাও ভেবেছি। ও বলল, ধন্যবাদ মাস্টারমশাই। আজ বহু বছর পর আমাকে মাস্টারমশাই বলে ডাকল। তারপরই ফোন ছেড়ে দিল। কিন্তু ওকে আরও একটু কথা বলার ছিল আমার। সেটা বলা হল না। দয়া করে আপনি যদি ওকে বলে দেন!

কী কথা?

এখন আমি আমার স্ত্রীর দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করি। রোজ।

আপনার গলাটা খুব ক্লান্ত শোনাচ্ছে।

হ্যাঁ। অনেক লতাপাতার বাঁধন ছিঁড়ে গেল তো।

এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

ডিস্টার্ব করলাম বলে ক্ষমা করবেন। অনেক ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি শিশিরবাবু, শুভরাত্রি।

সাত

আপনি এখন কোথায় বলুন তো! বেজিং না টোকিও নাকি নিউ ইয়র্ক কিংবা দিল্লি?

গোরুটি গোয়ালে ফিরেছে।

বাঁচা গেছে, গত ক'দিনে কতবার যে ফোন করেছি, কেবল সুইচ অফ। তারপর শুনলুম বেজিং-এ গিয়ে বসে আছেন। এইরকম দৌড়ঝাঁপের চাকরি বুঝি আপনার? গ্রেট ওয়াল দেখলেন?

দুঃখের বিষয় সেটা ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়।

একটা খবর শুনলাম। আপনার জন্য আর-একটা পাত্রী দেখা হয়েছে!

হ্যাঁ। এবং সকলেরই তাকে বেশ পছন্দ।

আপনার?

ছবি দেখেছি। বেশ দেখতে।

তাহলে তো আমরা হেরেই গেলাম।

হার-জিতের কিছু নেই। বিবাহযোগ্য ও যোগ্যাদের ফিরি করাই এ দেশের প্রথা। কিছু করার থাকে না।

জানি, দোষটা তো আমাদেরই। আমার বেঙ্গালুরু চলে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। ইচ্ছে ছিল— যাকগে, ভেবে আর কী হবে। একটু খারাপ লাগবে, এই যা। আপনি ভাল থাকবেন। আর মন দিয়ে বিয়েটা করুন তো।

আরে, বেঙ্গালুরু চলে যাচ্ছ, তোমাকে তো একটা ফেয়ারওয়েল দেওয়া দরকার।

কে দেবে বলুন?

পরশু আমার ডে অফ। একটু সময় হবে?

সত্যি ফেয়ারওয়েল দেবেন? কীভাবে শুনি?

লাঞ্চ হতে পারে।

পরশু আমার ছুটি নেই।

তাহলে?

ফেয়ারওয়েল না-ই বা দিলেন। আপনি তো আমাকে এখনও চোখে দেখেননি। ইউ উইল নট মিস মি।

চোখের দেখাটাও তো একটা মস্ত জিনিস। সেটা অন্তত হোক।

লাভ কী বলুন? সম্পর্কই যখন হবে না তখন মায়া বাড়ানোর কী দরকার?

চারদিকে মায়াদয়া যে বড্ড কমে যাচ্ছে কাঁকন। পৃথিবী একটু একটু করে নির্দয় হয়ে উঠছে টের পাও?

আচ্ছা, রাজি আছি। কোথায়, কখন?

দুর্গাপুরে। পরশু।

দুর্গাপুর! মাই গড!

জায়গাটা কি খারাপ?

ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জহ্নু বলল, বুঝিয়ে বলা যায় যদি নিজে বুঝতে পেরে উঠতাম।

আচ্ছা, আপনি যে পাজি, ভীষণ পাজি তা কি আপনাকে বলেছি?

বলেছ।

তাহলে আবার বলছি। আপনি ভীষণ পাজি। আর—

আর?

ইউ আর এ ডার্লিং।

আট

তুমি তো কিছুই খেলে না বাবা। আমি একটা রাধাবল্লভি খেয়েছি, আর অ্যাতোখানটা পোলাও। মাংসের ওটা কী ছিল বাবা, বলো না! পেজালা না? কী ভাল খেতে, বলো! আর চিংড়িটাও। আলুবখরা কী বাবা? একবার আনবে বাজার থেকে?... রাবড়িটায় না শুধুই সর আর সর, একদম ফ্যান্টাস্টিক। বোঁদে থাকলে বেশ হত। তবে পাশবালিশের মতো মিষ্টিটাও খুব ভাল, না বাবা...

ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো শীতের রাতে নয়নের হাত ধরে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল শিশির। তার একটা ভুবন চিরতরে হারিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার ছেলে নয়ন আজ পেট ভরে খেয়েছে। এত সুখাদ্যের আয়োজনে আনন্দে ঝলমল করেছে নয়নের মুখ। প্রাণভরে সেটাই দেখেছে শিশির।

বিয়ে হলে কি খুব সাজতে হয় বাবা?

হ্যাঁ।

বাঁধনমাসিকে একদম চেনা যাচ্ছিল না। আচ্ছা, জহ্নু মানে কী বাবা?

একজন ঋষির নাম। তার জানু থেকে গঙ্গা বেরিয়েছিল

বলে গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী।

বেশ নাম। না বাবা?

হ্যাঁ, বেশ নাম।

মা কেন বিয়েতে গেল না বাবা, গেলে কত ভাল জিনিস খেতে পারত!

তোমার মায়ের শরীরটা তো ভাল নেই।

কিন্তু মা তো ভাল হয়ে যাবে, না? একদম আগের মতো?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই হবে।

শীতরাত্রির কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্না চারদিকে এক রূপকথার জগৎ ফুটিয়ে তুলেছে। ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে শিশির যেন শুনতে পাচ্ছে সেই অন্ধ চড়াইপাখিটা দিশাহীন উড়তে উড়তে এখনও বলে চলেছে, ধন্যবাদ মাস্টারমশাই, ধন্যবাদ...

মায়াবী জ্যোৎস্নায়, শীতে, কুয়াশায় আবছা পথ বেয়ে বাপ-ব্যাটায় চুপচাপ দীর্ঘ মাঠটা পেরোতে লাগল।